গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬২ বর্ষ ২২ সংখ্যা ৮ - ১৪ জানুয়ারি, ২০১০ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in মূল্য ঃ ২ টাকা

হরিপুরে বিপজ্জনক পরমাণু কেন্দ্র লক্ষাধিক মানুষকে উচ্ছেদ করবে

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এক অখ্যাত গ্রাম হরিপুর আবার সংবাদের শিরোনামে। রুশ প্রযুক্তি ও জ্বালানির সাহায্যে হরিপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে গত ৭ ডিসেম্বর ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে চুক্তি হয়েছে। নতুন এক শিল্প গড়ে ওঠার সংবাদ সত্ত্বেও হরিপুরের অধিবাসীদের মধ্যে আনন্দ নয়, উদ্বেগ, আশঙ্কা ও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। শুধু হরিপুরের নয়, এ সংবাদ গোটা কাঁথি মহকুমার মানুষকেই উদ্বিগ্ন করেছে।

ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি নিয়ে আলোচনা কালে ভারত সরকার গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে ৫টি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই সময়েই সংবাদমাধ্যমে এ রাজ্যের পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের স্থান হিসাবে কাঁথি মহকুমার জুনপুট সংলগ্ন হরিপুরের নাম উঠে আসে। এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর কৃষক, খেতমজুর, মৎস্যজীবী সহ এলাকার সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে প্রবল আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। ২০০৬ সালের ১৭ নভেম্বর ভারতের শক্তি দপ্তরের অফিসাররা পুলিশ ও প্রশাসনের লোকজন নিয়ে হরিপুর পরিদর্শনে গেলে হরিপুরের ৫ কিমি আগে এস ইউ সি আই (সি)-এর নেতা-কর্মী সহ দলমত নির্বিশেষে ব্যাপক মানুষ তাঁদের পথ অবরোধ করেন। ফলে তাঁরা ফিরে যেতে বাধ্য হন। পরের দিন পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে অফিসাররা হরিপুর যাওয়ার চেষ্টা করলে বিপুল জনতা আবারও তাঁদের পথ অবরোধ করে। হরিপুর পরিদর্শন না করেই অফিসারদের ফিরতে হয়। জানা গেছে, এলাকা পরিদর্শন না করেই স্থান নির্বাচকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান এস কে জৈন (যিনি আবার নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যানও) ১৯ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে জানিয়েছেন, হরিপুরই পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উপযুক্ত জায়গা। ২০ নভেম্বর জুনপুট বাজারে দলমত নির্বিশেষে বিশাল জনতার উপস্থিতিতে এক গণকনভেনশনে আন্দোলনের মঞ্চ 'পরমাণু চুল্লি বিরোধী ও ভিটেমাটি জীবনজীবিকা বাঁচাও কমিটি' গঠিত হয়। কমিটির উদ্যোগে এই পর্বে হাজার হাজার মানুষের পদযাত্রা, মশাল মিছিল, গ্রামে গ্রামে সভা প্রভৃতি কর্মসূচি পালিত হয়। এরপর সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনের পরিণতিতে যখন সারা রাজ্য উত্তাল, তখন কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় সরকার বিষয়টি নিয়ে নীরব থাকে। তা আবার সংবাদের শিরোনামে এল ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর রাশিয়া সফরকালে হরিপুরে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে উভয় দেশের মধ্যে চুক্তি হওয়ার সংবাদে।

প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, প্রথমত, বিজ্ঞানী ও পরিবেশবিদরা যখন ব্যয়বহুল, নিরাপত্তাহীন, বিপজ্জনক প্রযুক্তি হিসাবে একে পরিত্যাজ্য বলে অভিহিত করছেন, তখন কেন আবার পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে? দ্বিতীয়ত, বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য রাজ্যের বহু অনুর্বর ও অকৃষি পতিত জমি থাকা সত্ত্বেও কৃষকের উর্বর কৃষিজমি এবং মৎস্যজীবীদের জীবিকার জন্য অপরিহার্য সমুদ্র উপকূলবর্তী এই এলাকা অধিগ্রহণ করে তাদের উৎখাত করা হবে কেন?

পরমাণু বিদ্যুৎ দূষণমুক্ত নয়

মুখ্যমন্ত্রী সহ সিপিএম নেতারা কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের মন্ত্রী-নেতাদের সাথে গলা মিলিয়ে বলছেন, পরমাণু বিদ্যুৎ নাকি পরিবেশ বান্ধব। সত্যিই কি তাই?

পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে মূল জ্বালানি ইউরেনিয়াম থেকে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের হার কম ঠিকই, কিন্তু আকরিক থেকে ইউরেনিয়াম নিষ্কাশনের সময়, এবং ইউরেনিয়াম থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সমগ্র প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পর্যায় পার করতে ফসিল ফুয়েল তথা কয়লার দহন অত্যন্ত প্রয়োজন। এর ফলে বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। তা হলে কীভাবে এ কথা বলা চলে যে, পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনে পরিবেশ দূষণ হয় না? এ ছাড়া রয়েছে পারমাণবিক বর্জ্যের মারাত্মক দূষণ।

বলা হচ্ছে, খনিজ জ্বালানি দ্রুত ফুরিয়ে যাবে, তাই কয়লা বা তেল পুড়িয়ে নয়, পরমাণু বিদ্যুৎই একমাত্র বিকল্প। এই বক্তব্যের সাথে বিশেষজ্ঞরা

ছয়ের পাতায় দেখুন

'আলু নেই' হাওয়া তুলে কোটি কোটি টাকা লুটে নিল মজুতদাররা

সম্প্রতি এ সংবাদ প্রকাশ্যে এসেছে যে, এখনও রাজ্যের ব্যবসায়ী এবং হিমঘর মালিকদের জিম্মায় কমপক্ষে দু'লক্ষ বস্তা আলু রয়েছে। নতুন আলু বাজারে এসে যাওয়ায় পুরানো আলুর চাহিদা নেই। ফলে মাত্র ২০-২৫ দিন আগেও যে আলু ২০ থেকে ২৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে তার দাম এখন ১১ টাকা। অন্যদিকে নতুন আলু বিক্রি হচ্ছে আট টাকা কেজি দরে। রাজ্য সরকারের প্রচ্ছন্ন মদতে কিছু হিমঘর মালিক ও বড় ব্যবসায়ী 'আলু নেই' হাওয়া তুলে দাম চড়িয়ে গত চার-পাঁচ মাস ধরে মোটা টাকা জনসাধারণের থেকে লুঠ করে নিল।

এস ইউ সি আই (সি) বারবার বলেছে যে, নানা কারণে এ বছর আলুর উৎপাদন কিছু কম হলেও রাজ্যের প্রয়োজনের তুলনায় তা বেশিই। এ কথা কৃষিমন্ত্রীও বিধানসভায় স্বীকার করেছিলেন। তবুও ব্যবসায়ী-কালোবাজারিদের মুনাফার স্বার্থে রাজ্য সরকার আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি। প্রবল জনমতের চাপে, সরকার কিছু করছে এটা দেখানোর জন্য অন্য রাজ্য থেকে বেশি দামে আলু আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কিন্তু রাজ্যের মুনাফাবাজ-কালোবাজারিদের গায়ে হাত দেয়নি। এভাবে আলু আনার মধ্য দিয়ে যেমন ভর্তুকি বাবদ বহু টাকা চলে গেল, আবার এই প্রক্রিয়ায় নানা স্তরে দুর্নীতিতে কত টাকা নয়ছয় হল কে তার হিসাব রাখে। এই ঘটনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়, কংগ্রেস-বিজেপির মতোই সিপিএম সরকার ও তার মন্ত্রীরা কীভাবে কালোবাজারি-মুনাফাখোরদের সাথে গভীর আঁতাতে আবদ্ধ। এরাই আবার মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে গরম বক্তৃতা দেয়। রাজ্য দেখায় কেন্দ্রকে, কেন্দ্র দেখায় রাজ্যকে। এভাবেই এরা জনসাধারণকে প্রতারণা করে চলেছে।

দশ দফা দাবিতে রাজ্যজুড়ে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ চলছে

৫ ফেব্রুয়ারি এক কোটি স্বাক্ষর নিয়ে মহামিছিল

জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে এস ইউ সি আই (সি)-এর লাগাতার আন্দোলনের অংশ হিসাবে রাজ্যপালের উদ্দেশে লিখিত স্মারকপত্রে নিচের ১০ দফা দাবির সমর্থনে স্বাক্ষর সংগ্রহ চলছে।

১) মজুতদারি ও কালোবাজারি বন্ধ করতে হবে। দ্রব্যমূল্য কমিয়ে জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আনতে হবে। খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সামগ্রিক বাণিজ্য চালু করতে হবে।

২) বিদ্যুতে উপযুক্ত পরিমাণ ভর্তুকি দিতে হবে এবং বিদ্যুতের বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহার করতে হবে।

৩) চাষিদের সুলভে ডিজেল, বিদ্যুৎ ও সার সরবরাহ করতে হবে এবং কালোবাজারি বন্ধ করতে হবে।

৪) সকল গরিব মানুষকে বিপিএল কার্ড দিতে হবে। রেশন ব্যবস্থা চালু রেখে খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করতে হবে এবং সকলকে ফটো রেশন কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫) সরকারি ঘোষণা মতো জব কার্ড হোল্ডারদের ১০০ দিনের কাজ দিতে হবে। কাজ দিতে না পারলে পুরো মজুরি দিতে হবে।

৬) সমস্ত বন্ধ কারখানা খুলতে হবে এবং কর্মচ্যুত ও ছাঁটাই শ্রমিকদের কাজে পুনর্বহাল করতে হবে।

৭) শিক্ষার ও স্বাস্থ্যের বেরসকারিকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ করতে হবে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ফি ও হাসপাতালে চার্জ বৃদ্ধি করা চলবে না। শিক্ষার ও স্বাস্থ্যের সব দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।

৮) শিশু ও নারী পাচার, নারী নির্যাতন অবিলম্বে বনধ করতে হবে।

৯) অবিলম্বে লালগড় থেকে যৌথবাহিনী প্রত্যাহার করতে হবে। রাষ্ট্রীয় ও দলীয় সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে। ছত্রধর মাহাতো এবং বিবেকানন্দ সাহু সহ আন্দোলনের সমস্ত নেতা-কর্মীর উপর থেকে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে মুক্তি দিতে হবে।

১০) রুরাল হেলথ বিল প্রত্যাহার করতে হবে।

ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের শিক্ষাশিবির

থিওসোফিক্যাল সোসাইটিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষাশিবির। ইনসেটে কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী ও কমরেড শঙ্কর সাহা।

সারা ভারত ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের উদ্যোগে সংগঠক ও সক্রিয় কর্মীদের এক কর্মশালা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল কলকাতার ত্রিপুরা হিতসাধনী সভাকক্ষে। দেশের ৯টি প্রদেশের প্রায় ৬০ জন নেতা-কর্মী ব্যাঙ্ক শিল্পের সামগ্রিক সমস্যা, বিভিন্ন ব্যাঙ্কের বিশেষ বিশেষ সমস্যা, নবম দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির প্রাক্কালে ইউএফবিইউ এর সাথে আইবিএ-র সমঝোতা কতখানি কর্মচারী স্বার্থবিরোধী, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংগঠন গড়ে তোলার সম্ভাবনা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে ২৬ ডিসেম্বর সারাদিনব্যাপী আলোচনা হয় এই কর্মশালায়। উপস্থিত প্রতিনিধিরা ১৪টি ব্যাঙ্কে এবং ১৯টি রাজ্যে ফোরামের সংগঠন গড়ে তোলা এবং প্রসারিত করার সম্ভাবনাগুলি খতিয়ে দেখে সুনির্দিষ্ট কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কর্মশালা পরিচালনা করেন এস ইউ সি আই (সি) দলের পলিটব্যুরো সদস্য এবং অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি'র সভাপতি কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী।

২৭ ডিসেম্বর কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তীর পরিচালনায় থিওসফিক্যাল সোসাইটি হলে এক শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়। কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী এক দীর্ঘ আলোচনায় পুঁজিবাদী শোষণ থেকে সমাজকে মুক্ত করার সংগ্রামে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার অপরিহার্যতা ও তার উপর ভিত্তি করে বর্তমান সময়ে শ্রমিক-কর্মচারীদের কর্তব্যের দিকগুলি তুলে ধরেন। সংগঠনের উপদেষ্টা কমরেড নীহার মুখার্জীর নির্দেশ উল্লেখ করে তিনি সংগঠনের সকল কর্মী-সংগঠকদের মার্কসবাদের শিক্ষা গভীরভাবে অনুশীলন করার আহ্বান জানান। ব্যাঙ্ক কর্মচারী ছাড়াও শিবিরে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নেতৃবৃন্দ।

বরানগরে ট্রাফিক সিগন্যালের দাবিতে আন্দোলন

২৮ ডিসেম্বর বরানগরে অনন্যা সিনেমা হলের সামনে বি টি রোডের ওপর এক বাস দুর্ঘটনায় ২৫ জন যাত্রী আহত হন, যার মধ্যে ৩ জনের আঘাত ছিল গুরুতর। দুর্ঘটনার খবর পাওয়ামাত্রই এস ইউ সি আই কর্মীরা দুর্ঘটনাস্থলে যান। গত দু'মাসে ডানলপ থেকে অনন্যার মধ্যে একের পর এক ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। যাতে মানুষ আহত হচ্ছে এমনকী নিহতও হয়েছেন। অথচ প্রশাসন নির্বিকার। বরানগরের বিটি রোডের ওপর বহু গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে কোনও ট্রাফিক পুলিশ নেই। এ বিষয়ে প্রশাসনিক উদাসীনতার প্রতিবাদে, বিটি রোড-বনহুগলি মোড়ে স্বয়ংক্রিয় ট্রাফিক সিগন্যালিং ব্যবস্থা চালু এবং বিটি রোডের ওপর সকল মোড়ে ট্রাফিক পুলিশ দেওয়া সহ ৫ দফা দাবিতে ২৯ ডিসেম্বর এস ইউ সি আই (সি) বরাহনগর-সিঁথি আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয় এবং বিটি রোড-বনহুগলি মোড় অবরোধ করা হয়। আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক কমরেড রমা মুখার্জীর নেতৃত্বে চার সদস্যের এক প্রতিনিধি দল বরানগর থানায় ডেপুটেশন দেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করা হয় এবং খুব শীঘ্রই তা রূপায়নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এই প্রতিনিধিদলে অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন কমরেডস্ কাজল ভট্টাচার্য, দেবু ব্যানার্জী ও মঞ্জু চক্রবর্তী।

একই দাবিতে ২৫ ডিসেম্বর অল ইন্ডিয়া ডিওয়াইও এবং অল ইন্ডিয়া ডিএসও-র বরানগর আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে বিটি রোড-বনহুগলি মোড়ে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। শত শত মানুষ এগিয়ে এসে স্বাক্ষর দেন। তাঁদের প্রবল উৎসাহ প্রমাণ করে যে এই দাবি দলমত নির্বিশেষে এলাকার মানুষের দাবি।

মুখ্যমন্ত্রীর নিকট
পঞ্চায়েত কর আদায়কারীদের গণডেপুটেশন

জেপিএ অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ গ্রাম পঞ্চায়েত কর আদায়কারী সমিতির উদ্যোগে পশ্চিমবাংলার প্রায় সমস্ত জেলা থেকে গ্রামপঞ্চায়েতে দীর্ঘ বছর ধরে কর্মরত কর আদায়কারী কর্মচারীরা নিয়মিত কর্মচারীর মর্যাদার দাবিতে ২১ ডিসেম্বর সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে জমায়েত হয়ে মিছিল করে রানি রাসমণি রোডের বিক্ষোভ সমাবেশে যোগ দেন।

সমাবেশ থেকে এক প্রতিনিধি দল মহাকরণে

পঞ্চায়েত মন্ত্রীর সাথে আলোচনার পরে তাঁর হাতে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে লেখা স্মারকলিপি জমা দেন। পঞ্চায়েত মন্ত্রী বলেন, দাবিগুলি পূরণ করার ক্ষমতা তাঁর নেই, অর্থমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। উল্লেখ্য, গত ২১ জুলাই অর্থমন্ত্রী তাঁর চেম্বারে জেপিএ-র নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েতে কর্মরত ৪২০০ জন করআদায়কারী কর্মচারীকে গ্রুপ 'ডি' কর্মচারী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

প্রতিনিধিবৃন্দ পঞ্চায়েতমন্ত্রীকে বলেন, ঐ প্রতিশ্রুতি কার্যকর না করা হলে কর আদায়কারীরা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য হবেন।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কর্মচারী আন্দোলনের নেতা জেপিএ-র সহসভাপতি বিমল জানা। প্রধান বক্তা হিসাবে জেপিএ-র সর্বভারতীয় সভাপতি অচিন্ত্য সিনহা বলেন, জেপিএ-র নেতৃত্বে সরকারি ক্ষেত্রে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মরত অনিয়মিত কর্মচারীরা ঐক্যবদ্ধভাবে ব্যাপক লড়াই গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কর আদায়কারীদেরও তাদের নিয়মিত কর্মচারীর মর্যাদার দাবি আদায় করতে হলে আরও ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ লড়াই গড়ে তুলতে হবে। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন করআদায়কারী সমিতির রাজ্য সম্পাদক সেক আমানুল্লা, সহসভাপতি তন্ময় ভট্টাচার্য ও অনিন্দ্য রায়চৌধুরী প্রমুখ জেপিএ নেতৃবৃন্দ।

শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় ৭ দফা দাবিতে ডেপুটেশন

২৯ ডিসেম্বর পূর্ব রেলের শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনের কতকগুলি জ্বলন্ত সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে শিয়ালদহ ডিআরএম-এর নিকট এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডিআরএম-এর অনুপস্থিতিতে এডিআরএম দাবিপত্র গ্রহণ করেন। দাবিগুলি হল ঃ (১) অতিরিক্ত একটি মহিলা কামরা সহ ১২ বগি ট্রেন, (২) দঃ বারাসত থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর পর্যন্ত ডবল লাইনের কাজ শুরু, (৩) অফিস টাইমে সকাল ও সন্ধ্যায় লক্ষ্মীকান্তপুর-শিয়ালদহ দুই জোড়া অতিরিক্ত ট্রেন, (৪) প্রতিটি স্টেশনে উপযুক্ত পরিচ্ছন্ন মহিলা শৌচাগার, (৫) জয়নগর মজিলপুর স্টেশনে রিজার্ভেশন কাউন্টার সহ অতিরিক্ত দৈনিক টিকিট কাউন্টার, (৬) ক্রশিং-এ ন্যূনপক্ষে ১৫ মিঃ আগে কোন ট্রেন কোন প্ল্যাটফরমে ঢুকবে তা ঘোষণা, (৭) স্টেশনগুলিতে অসামাজিক কাজকর্ম বন্ধ করা।

এডিআরএম বলেন, রেক এর অভাবে ১২ বগি ট্রেন দেওয়া যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে তিনি কথা বলবেন। অন্যান্য দাবিগুলির বিষয়ে তিনি বিভাগীয় প্রধানদের সাথে কথা বলে জানানোর আশ্বাস দেন।

দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড বাসুদেব ব্যানার্জী, পিন্টু দাস, লক্ষ্মীকান্তপুর রেলযাত্রী কমিটির পক্ষে রবীন মল্লিক, জয়নগর মজিলপুর রেলযাত্রী কমিটির পক্ষে বাপীন বৈদ্য সহ বেশ কিছু নিত্যযাত্রী ডেপুটেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন।

রাজ্য সরকারি কর্মচারী আন্দোলন

২২ ডিসেম্বর ওয়েষ্ট বেঙ্গল গর্ভমেন্ট স্ট্যাগলিং এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল গর্ভমেন্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (নবপর্যায়) ৯১-এর যৌথ উদ্যোগে আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি রদ, জঙ্গলমহল সহ সর্বত্র রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বন্ধ, মহার্ঘভাতার স্থায়ী আদেশনামা, সমস্ত শূন্যপদ পূরণ, অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ, মৃত-অক্ষম কর্মীর পোষ্যের নিঃশর্ত চাকরি সহ বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও অর্থমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

তিন শতাধিক কর্মচারীর স্লোগানমুখর মিছিল গোটা রাইটার্স পরিক্রমার পর সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরির সামনে এলে সেখানে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন নবপর্যায়-৯১-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিশির সরকার এবং ইউনিটি ফোরামের অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক কমরেড অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য। সভাপতিত্ব করেন যৌথসংগ্রামী মঞ্চ ও ইউনিটি ফোরামের আহ্বায়ক কমরেড ফটিক দে। সঞ্চালনা করেন কমরেড শুভাশীষ দাস। সভায় উপস্থিত ছিলেন যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের অন্যতম নেতা সুব্রত ভট্টাচার্য। মহাকরণ সংগ্রাম কমিটি এবং তার অন্তর্ভুক্ত সংগঠনগুলির প্রতিনিধিরাও বক্তব্য রাখেন।

এর পর এক প্রতিনিধি দল অর্থ দপ্তরের বিশেষ সচিবের হাতে স্মারকলিপি দেন। পরে সাংবাদিকদের আহ্বানে প্রেস কর্নারের পোডিয়ামে সাংবাদিক সম্মেলন করতে গেলে পুলিশ বাধা দেয়। উপরোক্ত দুটি সংগঠন আরও তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে বিভিন্ন প্রতিবাদী কর্মচারী গ্রুপ ও সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি নতুন সংগ্রামী সংগঠন গড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। দুই সংগঠনের বক্তারা জানান, রাজ্যব্যাপী এরই প্রস্তুতি চলছে। আগামী ১১ থেকে ১৩ জানুয়ারি জেলায় জেলায় জেলা শাসকের কাছে এই দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হবে।

সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় কেন ঘটল

দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত আন্তর্জাতিক দলিল

(শেষ পর্ব)

একমাত্র মার্কসবাদ ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আদর্শই বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীকে, নিপীড়িত জনগণকে মুক্তি সংগ্রামের পথ দেখাতে পারে, মানবসভ্যতাকে এই সর্বগ্রাসী ভয়ঙ্কর সঙ্কট থেকে বাঁচাতে পারে। একথা ঠিক সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শাসকবর্গ এবং বুর্জোয়া পণ্ডিতরা মহা উল্লাসে মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তারস্বরে নানা অপপ্রচার চালাচ্ছে। মার্কসবাদের সঠিক উপলব্ধি না থাকায় একদল মানুষ তার দ্বারা বিভ্রান্তও হচ্ছে। তাদের বুঝতে হবে, কয়েকটি সুনির্দিষ্ট কারণে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয় ঘটেছে এটা ঠিক, কিন্তু এর দ্বারা মার্কসবাদ ব্যর্থ, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধারণা কোনওভাবে ভ্রান্ত, এ কথা প্রমাণিত হয় না। কারণ, মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাওসে তুং-শিবদাস ঘোষ — বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের এই মহান পথপ্রদর্শকেরা কেউই দাবি করেননি যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একবার জয়যুক্ত হয়ে গেলে এবং সমাজতন্ত্র কয়েক দশক টিকে থাকলে, তারপর আর বিপর্যয়ের আশঙ্কা থাকবে না। বরং তাঁরা ঠিক উল্টো কথাই বলেছেন। তাঁরা বলেছেন পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে পৌঁছাবার ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র হচ্ছে একটা অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায় মাত্র, যে পর্যায়ে শেষ পর্যন্ত ঠিকমতো সংগ্রাম চালাতে পারলে সমাজ সাম্যবাদের দিকে এগোবে, আর না পারলে বিপরীতে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। বুর্জোয়াদের শক্তির উৎস কোথায় সে সম্পর্কে তার পরেই বলছেন, ''এবং যাদের ক্ষমতা শুধু আন্তর্জাতিক পুঁজির শক্তির মধ্যে, তাদের ক্ষমতা সম্পন্ন এবং স্থায়ী আন্তর্জাতিক যোগাযোগগুলির মধ্যেই নিহিত নেই, একই সঙ্গে অভ্যাসের শক্তি এবং ক্ষুদ্র উৎপাদনের শক্তির মধ্যেও তা নিহিত রয়েছে।'' (ঐ, পৃ: ৩) তিনি আরো বলেছেন, ''লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের অভ্যাসের শক্তি সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বাধা।'' (ঐ, পৃ: ৩২)

এই অভ্যাসের শক্তি বলতে লেনিন পুরানো সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততান্ত্রিক ও বুর্জোয়া ভাবনা-ধারণা, আচার-আচরণ, সংস্কৃতিকেই বুঝিয়েছেন, যেটা স্বাভাবিকভাবেই রুশ দেশের শ্রমিক ও জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছিল। রাশিয়ার বিপ্লব একেবারে সূচনাতেই শিল্প ও কৃষিতে বৃহৎ মালিকানার অবসান ঘটিয়েছিল, বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে শিল্প ও কৃষি থেকে বৃহৎ পুঁজিকে উচ্ছেদ করেছিল, কিন্তু সেখানে পুঁজিবাদের বিকাশ খুবই অনুন্নত থাকায় দীর্ঘদিন ধরে ক্ষুদ্র মালিকানার অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয়েছিল এবং ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথে সমাজতান্ত্রিক মালিকানায় রূপান্তরিত করা হচ্ছিল। আর লেনিন বলেছেন, ''ক্ষুদ্র উৎপাদন প্রতিদিন, প্রতি ঘন্টায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে পুঁজিবাদের জন্ম দেয়।'' (ঐ, পৃ: ৬) এই পর্যায়ে কেন 'সর্বহারার একনায়কত্ব' চাই এবং তার করণীয় কাজ কি হবে, এ সম্পর্কে লেনিন বলেছেন,''সর্বহারার একনায়কত্বের অর্থ হচ্ছে, পুরানো সমাজের শক্তি ও ঐতিহ্যগুলির বিরুদ্ধে রক্তাক্ত ও রক্তহীন, হিংসাত্মক ও শান্তিপূর্ণ, সামরিক ও অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত ও প্রশাসনিক অটল সংগ্রাম...এবং জীবন বাজি রেখে দীর্ঘ ও কঠোর সংগ্রাম ছাড়া বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে বিজয় অসম্ভব।'' (ঐ, পৃ: ৩২, ৬) এইসব কারণে লেনিনও বলেছিলেন, সমাজতন্ত্রের পর্যায়ে অধিকতর শক্তিশালী প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে চূড়ান্ত জয় নির্ভর করছে এই বিশেষ ধরনের নতুন শ্রেণীসংগ্রামের সাফল্যের উপরই। যত দিন যাচ্ছে রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রাম তত যে আরো তীব্রতর হচ্ছে, লেনিনের মৃত্যুর ৯-১০ বছর বাদে তা উল্লেখ করে স্ট্যালিন বলেছিলেন,''সমাজতন্ত্র যত এগোবে, শ্রেণীসংগ্রাম তত তীব্র হবে।'' লেনিনের মৃত্যুর পর চূড়ান্ত ব্যক্তিবাদী, ক্ষমতালিপ্সু ট্রটস্কি, কামেনেভ, জিনোভিয়েভ, বুখারিনের মতো কিছু নেতা লেনিনবাদের অপব্যাখ্যা করে পরাস্ত শোষকশ্রেণীর স্বার্থে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির কর্মসূচিকে পদে পদে বাধাদান করতে থাকে, যার পেছনে বাইরের সাম্রাজ্যবাদের মদত ছিল। স্ট্যালিন তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে লেনিনবাদের যথার্থ মর্মবস্তু কি, সেটা সেদেশের ও বিশ্বের জনগণের সামনে উপস্থিত করেন। প্রমাণিত হয় ট্রটস্কি বুখারিনরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে বিচ্যুত। এই প্রতিবিপ্লবীরা যখন নানা তত্ত্বের বাগাড়ম্বরে লেনিনের শিক্ষাবলীর গুরুত্ব লঘু করে দেখানোর অপচেষ্টা করছিল, তখন স্ট্যালিনই বিশ্বের শ্রমিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামনে দেখান, ''সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের বর্তমান যুগে লেনিনবাদই হচ্ছে মার্ক্সবাদ।'' (ফাউন্ডেশনস্ অব লেনিনইজম, পৃ: ৩) তিনি দেখালেন, লেনিন ও লেনিনবাদকে আজকের দিনে মার্কসবাদের অথরিটি গণ্য করেই সকলকে এগোতে হবে। আদর্শগতভাবে পরাস্ত হয়ে ষড়যন্ত্রকারীরা পার্টির প্রতি আনুগত্যের ভাণ করে গোপনে গোপনে আরও মারাত্মক ষড়যন্ত্র করতে থাকে। এটা ধরা পড়ে সোভিয়েত পার্টি ও রাষ্ট্রের অন্যতম কর্ণধার, স্ট্যালিনের সুযোগ্য অনুগামী ও সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম বিশিষ্ট নেতা কমরেড কিরভকে ১৯৩৪ সালে মস্কোয় স্মলনিতে পার্টির সদর দপ্তরে আকস্মিকভাবে গুলি করে হত্যার পর। হত্যাকারী স্বীকারোক্তিতে জানায়, দীর্ঘদিন ধরে জার্মান ফ্যাসিস্ট শক্তির মদতে তারা কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাদের একে একে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে। অনুসন্ধান করে আরও জানা যায় যে এই প্রতিবিপ্লবী চক্র সমগ্র দেশে সর্বক্ষেত্রে এমন ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছে, যাতে হিটলার কর্তৃক সোভিয়েত আক্রমণের সুযোগে এই চক্র ক্ষমতা দখল করতে পারে। এই ষড়যন্ত্রের মাথা হিসাবে গোপনে কাজ করে এসেছে কামেনেভ, জিনোভিয়েভ, বুখারিন এবং দেশ থেকে নির্বাসিত ট্রটস্কি ও তার অনুচরেরা। তদন্তে সবই প্রমাণ হয় এবং বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশের রাষ্ট্রদূত ও খ্যাতনামা আইনজীবীদের সামনে ধৃত ষড়যন্ত্রকারীদের প্রকাশ্যে বিচার হয়,অপরাধ ঢাকার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করলেও প্রমাণ সহ জেরার মুখে প্রত্যেকেই অপরাধ স্বীকার করতে বাধ্য হয়।এবং তাদের দন্ডাদেশ দেওয়া হয়। এই বিচারের নিরপেক্ষতায় ও সত্যনিষ্ঠায় এই বিদেশিরা সেদিন মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, তাদের দেশেও এই ধরনের ন্যায়বিচার হয় না। যদিও একদল এখনও তীব্র কমিউনিস্ট বিদ্বেষ থেকে এই বিচার নিয়ে স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে কুৎসা রটায়। ফ্যাসিস্ট জার্মানি কর্তৃক সোভিয়েত আক্রমণের প্রাক্কালে এই ষড়যন্ত্রের জাল এমনভাবে বিস্তার করা হয়েছিল যে, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টিকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল সর্বস্তরের সদস্যদের পার্টি কার্ড বাতিল করে পুনরায় তাদের প্রত্যেকের কার্যকলাপ-চরিত্র ভাল করে পরীক্ষা করে সেই রেকর্ডের ভিত্তিতে সদস্যপদ রিনিউ করা হবে। সমাজের সর্বস্তরে এই অভিযান চলে। সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদের প্রত্যক্ষ মদতে প্রতিবিপ্লবী চক্রের ষড়যন্ত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্বকে কতটা বিপন্ন করলে এই রকম ব্যবস্থা নিতে হয়, তা বোঝা দুঃসাধ্য নয়। এই ব্যাপক কর্মকান্ডে স্বাভাবিকভাবে কিছু বাড়াবাড়িও ঘটে যায়। স্ট্যালিন নিজেই পার্টির অষ্টাদশ কংগ্রেসের রিপোর্টে এই বাড়াবাড়ির কথা স্বীকার করেছিলেন। স্ট্যালিনের পক্ষে হাতে কলমে সকলকে বিচার করা সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে একথা ইতিহাসে প্রমাণিত যে যদি এই 'গ্রেট পার্জ' অভিযান না করা হত এবং তা সফল না হত, হিটলার সোভিয়েত আক্রমণের সময় সেই দেশে বহু এজেন্ট পেত যারা যুদ্ধের সময় রাশিয়ার অভ্যন্তরে অন্তর্ঘাত চালাত। এবং তাহলে হয়ত সোভিয়েতকে বাঁচানো সম্ভব হত না এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্যাসিস্ট জার্মানি ও জাপানকে পরাস্ত করে বিশ্বকে রক্ষা করতে পারত না। কারণ সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্স ও ইউরোপের বহু দেশ হিটলারের আক্রমণের সামনে তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ শেষে জার্মানি-জাপানের পরাজয় নিশ্চিত দেখে শেষের দিকে শুধু দখলদারী অভিযানে নেমেছিল, আর যুদ্ধের সময় অস্ত্র বিক্রি করে পয়সা কামিয়েছিল। ফলে এটা প্রমাণিত যে ১৯৩৩- ৩৪ সালেও সোভিয়েত দেশের অভ্যন্তরে প্রতিবিপ্লবী শক্তি অত্যন্ত সক্রিয় ও শক্তিশালী ছিল। এই প্রতিবিপ্লবীরা পরাস্ত হলেও নির্মূল যে হয়নি, বরং বিপদ হিসাবে থেকে গেছে, এটা বোঝা যায় ১৯তম কংগ্রেসে ম্যালেনকভ প্রদত্ত রিপোর্ট থেকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ঐতিহাসিক বিজয়ের পর সমগ্র বিশ্ব যখন সোভিয়েট ইউনিয়ন ও স্ট্যালিনের জয়গানে মুখর, যুদ্ধে বিধ্বস্ত সোভিয়েত অর্থনীতি যখন অতি অল্প সময়েই পুনর্গঠিত ও যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার মত জায়গায় যাচ্ছে, তখন ১৯৫২ সালে ১৯তম পার্টি কংগ্রেসে সোভিয়েত ইউনিয়নের আভ্যন্তরীণ গুরুতর বিপদ সম্পর্কে গভীর উদ্বেগে স্ট্যালিন যেধরনের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, ইতিপূর্বে বিপ্লব পরবর্তী বহু গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কটের সময়ও সেরকম শোনা যায়নি। মার্কসবাদ-বিরোধী, বিপ্লব-বিরোধী বিভিন্ন শক্তির অস্তিত্ব, সমাজে ও দলের ভেতরে বুর্জোয়া আদর্শ এবং ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তিক মানসিকতা ও প্রভাবের বিপদ সম্পর্কে সচেতন করে স্ট্যালিন কংগ্রেসের রিপোর্টে বলেন — ''কিন্তু বুর্জোয়া ভাবাদর্শের অবশেষ (vestiges) আজও আমাদের দেশে আছে। ব্যক্তি সম্পত্তিকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা নৈতিকতাবোধ ও মানসিকতার অবশিষ্টাংশগুলি (relics of private-property mentality and morality) আজও টিকে আছে। এগুলি কখনও আপনা আপনিই শেষ হয়ে যাবে না; এগুলির টিকে থাকার ক্ষমতা খুব বেশি এবং এরা নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে। আবার, বাইরের পুঁজিবাদী দেশগুলি এবং আমাদের দেশের ভিতরকার সোভিয়েত রাষ্ট্রবিরোধী গ্রুপগুলির অবশিষ্টাংশ — যাদের সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা যায়নি — এই উভয় পক্ষ থেকে সমাজতন্ত্রবিরোধী চিন্তা, ভাবনা-ধারণা এবং মানসিকতা সোভিয়েত ইউনিয়নে অনুপ্রবেশ করবে না — এমন গ্যারান্টিও আমাদের কাছে নেই।'' (উনবিংশ কংগ্রেসের রিপোর্ট, পৃ: ৭৮) পার্টির মধ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার চর্চা যে অবহেলিত হচ্ছে এবং শুধু উৎপাদন বৃদ্ধির ঝোঁক বাড়ছে — একথা উল্লেখ করে এই রিপোর্টে তিনি বলছেন, ''মস্কো সংগঠনের মতো অগ্রণী পার্টি সংগঠনেও মতাদর্শ চর্চার দিকে যথেষ্ট নজর দেওয়া হচ্ছে না। এই অবহেলা চলতে দেওয়া যায় না। যখনই মতাদর্শ চর্চার শৈথিল্য ঘটছে, তখনই সমাজতন্ত্রবিরোধী চিন্তা ও ভাবধারার পুনরুত্থানের উর্বর জমি তৈরি হচ্ছে।'' (ঐ, পৃ: ৭৭-৭৮) তিনি আরও বলেছেন, ''আদর্শগত চর্চা যথাযথভাবে পরিচালনা না করা এবং এই চর্চার বিষয়বস্তুকে যথাযথ এবং অক্ষুন্ন রাখতে না পারার ফলেই আমরা প্রায়শই আমাদের বই, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিনে এবং বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য মতাদর্শগত প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপে মারাত্মক ত্রুটি- বিচ্যুতি দেখতে পাচ্ছি .... আদর্শগত চর্চার এমন কোনও ক্ষেত্র যদি থাকে, যেকোনও কারণেই হোক, তা পার্টি সংগঠনের নজরের বাইরে চলে গিয়েছে, কোনও একটি ক্ষেত্রেও যদি পার্টির নেতৃত্ব ও প্রভাব শিথিল হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আমাদের বিরোধী শক্তিগুলি, লেনিনবাদ বিরোধী দুষ্ট চক্র যাকে পার্টি উৎপাটিত করা সত্ত্বেও যার অবশিষ্টাংশ রয়ে গিয়েছে — তারা সেই ক্ষেত্রগুলিকেই কব্জা করবে এবং তাদের কাজে লাগাবে এমনভাবে যাতে তারা নিজেদের রাজনৈতিক লাইনের প্রভাব বাড়িয়ে তুলতে পারে, হাজার একটা অমার্কসীয় 'চিন্তা' ও 'ধারণা' পুনরুজ্জীবিত করতে পারে, ছড়িয়ে দিতে পারে''। (ঐ, পৃ: ৭৮) তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, ''মতাদর্শের চর্চা করা পার্টির সর্বপ্রধান কর্তব্য। এই গুরুত্ব লঘু করে দেখলে পার্টি ও রাষ্ট্রের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রভাব দুর্বল হলে, তার দ্বারা বুর্জোয়া ভাবধারার প্রভাবকে শক্তিশালী করা হবে।'' (ঐ, পৃ: ৭৭) এই রিপোর্ট থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, সমূহ বিপদের আশঙ্কায় পার্টি ও দেশকে সজাগ করে স্ট্যালিন আরেকটি সংগ্রামের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু কয়েকমাস বাদে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে সেটা আর হয়ে ওঠে নি। যে প্রতিবিপ্লবী শক্তি সম্পর্কে স্ট্যালিন হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন,তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সেই শক্তির প্রতিনিধি হিসাবেই ক্রুশ্চেভচক্র ক্ষমতা দখল করে এবং প্রথম কাজ হিসাবেই স্ট্যালিনের এইসব হুঁশিয়ারিগুলিকে 'ভ্রান্ত', 'বাড়াবাড়ি', 'দমনপীড়ন চালাবার হাতিয়ার', 'সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র বিরোধী', 'লেনিনবাদ বিরোধী', ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে সংগ্রামের লাইনটিকেই বাতিল করে দেয়। শুধু তাই নয়, 'ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে লড়াই' করার স্লোগান তুলে এবং বিভ্রান্তির ধূম্রজাল সৃষ্টি করে ক্রুশ্চেভ শোধনবাদী চক্র স্ট্যালিনের অথরিটিকে লঘু করতে থাকে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের যেসব বিপ্লবী তত্ত্বগুলিকে স্ট্যালিন আরও বিকশিত, সমৃদ্ধ ও উন্নত করেছেন, সেগুলির বিরুদ্ধেও তারা আক্রমণ চালায় এবং লেনিনবাদের দোহাই দিয়ে দেশের ভিতরে ও আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনে চূড়ান্ত সংশোধনবাদী ধ্যানধারণা এবং নানা সোসাল ডেমোক্র্যাটিক ভাবধারার প্রসার ঘটাতে থাকে। ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে পরিচালিত সোভিয়েট পার্টির ২০তম কংগ্রেসের রিপোর্ট পর্যালোচনা করে সেই সময়েই কমরেড শিবদাস ঘোষ এই কংগ্রেসের আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতি সংক্রান্ত নানা বিশ্লেষণকে সোভিয়েত পার্টির পূর্বতন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী লাইন থেকে বিচ্যুতি ও সংশোধনবাদী বলে দেখিয়েছিলেন। 'ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে লড়াই' করার নামে যেভাবে স্ট্যালিনের অথরিটিকে খাটো করার ষড়যন্ত্র চলছিল তার বিপদ সম্পর্কেও তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। এর কিছুদিন পরে ১৯৬২ সালে তিনি বলেছিলেন, ''স্ট্যালিনের অথরিটিকে অস্বীকার করার এবং পরিণামে লেনিনবাদ সম্পর্কে সোস্যাল ডেমোক্র্যাসি ও ট্রটস্কিবাদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্ট্যালিনের ব্যাখ্যা ও উপলব্ধি যা নিয়ে আমরা চলেছি তাকে পরিত্যাগ করার অবধারিত ফল হবে মার্কসবাদ লেনিনবাদের নামে যাবতীয় প্রতিবিপ্লবী চিন্তাভাবনা আমদানির রাস্তা খুলে দেওয়া। এক কথায় এর দ্বারা মহান লেনিন তথা লেনিনবাদের মর্যাদাকেই বাস্তবে ভুলুণ্ঠিত করা হবে।'' (সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির স্ট্যালিনবিরোধী পদক্ষেপ প্রসঙ্গে, নির্বাচিত রচনাবলী, খণ্ড ১, পৃ: ৮৫-৮৬)

১৯৫৬ সালের পর থেকে কমরেড শিবদাস ঘোষ সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির শোধনবাদী অধঃপতন যেমন যেমন লক্ষ্য করেছেন তেমন তেমন বিশ্বের কমিউনিস্টদের অবহিত করেছেন, সচেতন করার নিরলস প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির একটার পর একটা বিচ্যুতি কি করে ঘটছে, তা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, ''আদর্শগত অবনমন ও পশ্চাদপদতা এবং চেতনার নিম্নমানই সংশোধনবাদের মূল কারণ''। (চেকোশ্লোভাকিয়ায় সোভিয়েট মিলিটারি হস্তক্ষেপ, রাশিয়ায় সংশোধনবাদের ও পুঁজিবাদের বিকাশ

সাতের পাতায় দেখুন

মহান নভেম্বর বিপ্লবের অবিস্মরণীয় শিক্ষা ও তাৎপর্য

(শেষ পর্ব)

অস্থায়ী সরকারের সংকট

বলশেভিকরা যখন বিপ্লবের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতিতে নিয়োজিত, অস্থায়ী সরকার তখন জনস্বার্থের বিরুদ্ধে একের পর এক পদক্ষেপ নিয়ে যাচ্ছিল। ১৮ এপ্রিল বিদেশমন্ত্রী বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার মিত্র দেশগুলিকে জানান, জয় না হওয়া পর্যন্ত গোটা দেশ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে প্রস্তুত এবং মিত্র দেশগুলির সঙ্গে জারের করা চুক্তি রক্ষায় অস্থায়ী সরকার দায়বদ্ধ। ১৯ এপ্রিল বিদেশমন্ত্রীর এই ঘোষণা প্রকাশ পেলে মানুষ বুঝতে পারে, জারের করা চুক্তি রক্ষার অজুহাতে অস্থায়ী সরকার এই যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে অবলীলায় সাধারণ মানুষের রক্ত ঝরাতে থাকবে। ২০ এপ্রিল বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি জনসাধারণের কাছে অস্থায়ী সরকারের সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর আহ্বান জানাল। ২০-২১ এপ্রিল এক লক্ষেরও বেশি শ্রমিক ও সৈনিক বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হল। তাদের পতাকায় লেখা ছিল — 'গোপন চুক্তি প্রকাশ করতে হবে', 'যুদ্ধ বন্ধ কর', 'সোভিয়েটের হাতে সমস্ত ক্ষমতা দিতে হবে', ইত্যাদি। শ্রমিক ও সৈনিকরা মিছিল করে অস্থায়ী সরকারের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকল। নেভেস্কি প্রসপেক্টস ও অন্যান্য জায়গায় বুর্জোয়া গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ চলতে থাকল। প্রতিবিপ্লবী কর্নিলভ বিক্ষোভকারীদের উপর গুলি চালাবার আদেশ দিল সৈন্যদের, কিন্তু সৈন্যরা তা পালন করতে অস্বীকার করল।

বিক্ষোভ চলাকালীন পেট্রোগ্রাড পার্টি কমিটির একটি ছোট গোষ্ঠী, অবিলম্বে অস্থায়ী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার স্লোগান তোলে। বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি একে 'বামপন্থী হঠকারিতা' আখ্যা দিয়ে তীব্র সমালোচনা করে বলে, এই স্লোগান সঠিকও নয় এবং এই স্লোগান তোলার সময়ও উপস্থিত হয়নি। পার্টি যেভাবে সোভিয়েটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণ ভাবে বিপ্লবের অগ্রগতি ঘটাবার পরিকল্পনা করেছে, এই স্লোগান তা নষ্ট করে দেবে।

২০-২১ এপ্রিলের ঘটনা অস্থায়ী সরকারের সংকট ডেকে আনে। জনগণের আন্দোলনের চাপে সরকারের দুই মন্ত্রী পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। গঠিত হয় প্রথম অস্থায়ী 'জোট' সরকার। এই সরকারে বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধিরা ছাড়াও মেনশেভিক ও সোস্যালিস্ট রেভোলিউশনারি পার্টির প্রতিনিধিরা যোগ দেয়। এভাবেই তারা জনসাধারণের পক্ষ ত্যাগ করে প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়াশ্রেণীর শিবিরে চলে যায়।

বলশেভিক পার্টির এপ্রিল সম্মেলন

মেনশেভিক ও সোস্যালিস্ট রেভোলিউশনারিদের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে ২৪ এপ্রিল পার্টির সপ্তম সম্মেলনে বলশেভিকরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূরক হিসাবে যুদ্ধ, অস্থায়ী সরকার, সোভিয়েট, কৃষি সমস্যা, জাতি সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে পার্টির নীতি নির্ধারণ করে। বলশেভিক পার্টি এই প্রথম প্রকাশ্যে সম্মেলন করতে পারল। এই সম্মেলনেই নীতিবিষয়ক বিভিন্ন আলোচনায় কামেনেভ, জিনোভিয়েভ, বুখারিন, রাইকভ, পিয়াতাকভ প্রমুখের সুবিধাবাদী চিন্তার উন্মোচন ঘটে।

এই সম্মেলনে কামেনেভ ও রাইকভ লেনিনের বক্তব্যের বিরোধিতা করেন। মেনশেভিকদের সুরে সুর মিলিয়ে তাঁরা জোর দিয়ে বলতে থাকেন যে, রাশিয়া এখনও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করার পক্ষে উপযুক্ত হয়নি, সেখানে কেবলমাত্র একটি বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই সম্ভব। তাঁদের অভিমত ছিল, ওই পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র অস্থায়ী সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার কাজেই পার্টি এবং শ্রমিকশ্রেণী নিজেদের আবদ্ধ রাখুক। বাস্তবে, তাঁরা মেনশেভিকদের মতোই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে রক্ষা করা এবং রাষ্ট্রক্ষমতা বুর্জোয়াশ্রেণীর হস্তগত রাখার স্বার্থেই কাজ করছিলেন।

জনগণকে সংগঠিত করতে বলশেভিক পার্টির সাফল্য

এপ্রিল সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বলশেভিক পার্টি জনসাধারণকে জয় করে আসন্ন সংগ্রামের জন্য তাদের তৈরি করা ও সংগঠিত করার কাজ পুরোদমে শুরু করে দেয়। সেই সময়ে পার্টিকর্মীদের কাজ ছিল ধৈর্যের সঙ্গে বলশেভিক পার্টির পরিকল্পনা জনগণকে বোঝানো এবং মেনশেভিক ও সোস্যালিস্ট রেভোলিউশনারিদের আপসকামী চরিত্র জনসাধারণের সামনে তুলে ধরে এই পার্টিগুলির প্রভাব থেকে জনগণকে মুক্ত করা এবং সোভিয়েটগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা।

এই সময়ে সোভিয়েটগুলির মধ্যে কাজ করা ছাড়াও বলশেভিকরা ট্রেড ইউনিয়ন এবং কারখানা কমিটিগুলির মধ্যেও ব্যাপকভাবে কাজ করতে

ভাষণরত লেনিন

থাকে। সেনাবাহিনীর মধ্যেও বলশেভিকদের কাজ ছড়িয়ে পড়ে। সর্বত্র সামরিক সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। ফ্রন্টগুলিতে থাকা সৈন্যদের সক্রিয় বিপ্লবীতে পরিণত করার কাজে বিশেষ ভূমিকা নেয় বলশেভিকদের পত্রিকা 'ওকোপনায়া প্রাভদা'। বলশেভিক পার্টির কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল হিসাবে নানা শহরে, বিশেষত জেলাগুলিতে শ্রমিকরা নতুন করে সোভিয়েটের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে এবং মেনশেভিক ও সোস্যালিস্ট রেভোলিউশনারিদের তাড়িয়ে দিয়ে বলশেভিক পার্টির কর্মী-সমর্থকদের নির্বাচিত করে।

৩ জুলাই পেট্রোগ্রাডের ভাইবর্গ জেলায় জনতার স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। সারাদিন ধরে বিক্ষোভ চলে। বিভিন্ন ছোট ছোট মিছিল একজোট হয়ে বিক্ষোভ মিছিল বিশাল আকার ধারণ করে। সশস্ত্র এই মিছিল সোভিয়েটের হাতে সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানাতে থাকে। বলশেভিক পার্টি সেই সময় সশস্ত্র আন্দোলনকে সমর্থন করেনি। কারণ, তারা বুঝতে পেরেছিল, জনসাধারণকে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত না করেই সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটলে প্রতিবিপ্লবীদের পক্ষে অতি সহজেই তা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, কোনও মতেই জনতার তুমুল বিক্ষোভকে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না, তখন মিছিলটিকে শান্তিপূর্ণ ভাবে পরিচালনা করার জন্যই বলশেভিক পার্টি এতে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। লক্ষাধিক নরনারী পেট্রোগ্রাডে মিছিল করে সোভিয়েটের হাতে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ, সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের সঙ্গে আঁতাত বন্ধ করা এবং সক্রিয় শান্তি নীতি প্রণয়ন করার দাবিতে স্লোগান দিতে থাকে। কিন্তু শান্তিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এই মিছিলের উপর প্রতিবিপ্লবী শক্তি সশস্ত্র আক্রমণ চালাল; মিছিলে অংশ নেওয়া শ্রমিক ও সৈনিকের রক্তে ভেসে গেল পেট্রোগ্রাডের রাস্তাগুলি।

বিক্ষোভ মিছিলে মারাত্মক আঘাত হানার পর মেনশেভিক ও সোস্যালিস্ট রেভোলিউশনারিরা বুর্জোয়াশ্রেণী ও সেনাকর্তাদের সাহায্য নিয়ে বলশেভিক পার্টির উপর হানাদারি শুরু করল। প্রাভদা, সোলদাতস্কায়া প্রাভদা সহ বলশেভিক পার্টির বেশ কয়েকটি সংবাদপত্র প্রকাশের উপর তারা নিষেধাজ্ঞা জারি করল। ভোইনভ নামে এক শ্রমিককে রাস্তায় প্রাভদা বুলেটিন বিক্রি করার অপরাধে গুলি করে মারা হল। চারিদিকে ধরপাকড় চলতে লাগল। ৭ জুলাই লেনিনের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হল। বলশেভিক পার্টির বেশ কয়েকজন সামনের সারির নেতা গ্রেপ্তার হলেন। পার্টির পত্রপত্রিকা যেখানে ছাপা হত, সেই ছাপাখানা ধ্বংস করে দেওয়া হল।

কেরেনস্কি, স্কোবেলেভ, চের্নভ প্রমুখ মেনশেভিক ও সোস্যালিস্ট রেভোলিউশনারি পার্টির নেতাদের নিয়ে গঠিত অস্থায়ী জোট সরকার এইভাবে সরাসরি প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপের হোতা বনে গেল। শান্তিনীতি অনুসরণ করার বদলে এই সরকার যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নীতি গ্রহণ করল; সুরক্ষিত করার বদলে অস্ত্রের জোরে শ্রমিক ও সৈনিকদের কাছ থেকে গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি কেড়ে নেওয়ার নির্মম চেষ্টা চালাল। রাশিয়ার বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধিরাও যে কাজ করতে সাহস করেনি, সেই কাজ নির্দ্বিধায় করে ফেলল 'সোস্যালিস্ট' নামধারী কেরেনস্কি, চের্নভরা।

রাশিয়ার দ্বৈতশক্তির দিন শেষ হল, সমস্ত ক্ষমতা করায়ত্ত করে ফেলল অস্থায়ী জোট সরকার। সোভিয়েটগুলি কেবল ওই সরকারের লেজুড় হিসাবেই টিকে রইল। একই সঙ্গে শেষ হল বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ পর্যায়। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বলশেভিক পার্টি তার রণকৌশল পাল্টানোর সিদ্ধান্ত নিল। লেনিন সহ পার্টির অন্য নেতাদের জন্য গোপন আস্তানার ব্যবস্থা করার পাশাপাশি গোটা পার্টিই 'আন্ডারগ্রাউন্ডে' চলে গেল। 'রাজলিভ' স্টেশনের কাছে এক বস্তিতে লেনিন আত্মগোপন করলেন। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে সোভিয়েটকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ নিয়ে বলশেভিক পার্টি সরকারের নজরদারি এড়িয়ে অত্যন্ত গোপনে কাজ চালাতে শুরু করল।

বলশেভিক পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেস

এমন পরিস্থিতিতেই অত্যন্ত গোপনে কমরেড স্ট্যালিনের নেতৃত্বে ২৬ জুলাই থেকে ৩ আগস্ট পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল। অস্থায়ী সরকারের গোয়েন্দারা হন্যে হয়ে লেনিনকে খুঁজছিল। ফলে লেনিন কংগ্রেসে উপস্থিত থাকতে পারেননি। কিন্তু গোপন আস্তানা থেকেই তিনি স্ট্যালিন, মলোটভ, অর্দ্‌জোনিকিদ্‌জে প্রমুখ ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধাদের মাধ্যমে শ্রমিকদের প্রতি নির্দেশ পাঠাতে থাকেন।

ষষ্ঠ কংগ্রেসে ১৫৭ জন প্রতিনিধি অংশ নিয়েছিলেন। সেইসময় পার্টির সদস্য সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৪০ হাজার। আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাওয়ার আগে বলশেভিক পার্টি রুশ ও অন্যান্য ভাষায় ৪১টি পত্রপত্রিকা প্রকাশ করত।

রুশ বিপ্লবের ইতিহাসে বলশেভিক পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেসের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই কংগ্রেসেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কিত লেনিনের ঐতিহাসিক তত্ত্ব নানা তর্ক-বিতর্কের শেষে গৃহীত হয়। ট্রটস্কি, তাঁর অনুগামী প্রেওব্রাঝেস্কি, বুখারিন প্রমুখ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব ও রণনীতি-রণকৌশলের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, পশ্চিমে অর্থাৎ ইউরোপের উন্নত দেশগুলিতে বিপ্লব না হওয়া পর্যন্ত রাশিয়ায় সর্বহারাশ্রেণীর পক্ষে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল সম্ভব হবে না, সম্ভব হলেও তাকে রক্ষা করা যাবে না। তাঁরা চিরস্থায়ী বিপ্লবের তত্ত্ব বলে একটি তত্ত্ব হাজির করেন। তাঁদের আরেকটি বক্তব্য ছিল যে, বিপ্লবে সর্বহারাশ্রেণীর পাশে কৃষকদের পাওয়া যাবে না, তারা বিপ্লবের বিরোধিতা করবে।

কমরেড লেনিনের শিক্ষার ভিত্তিতে কমরেড স্ট্যালিন এই সব ভ্রান্ত ও সুবিধাবাদী মতকে পরাস্ত করেন। বুর্জোয়াশ্রেণীর দমনমূলক সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কীভাবে বিপ্লবের অগ্রগতি ঘটছে, অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় তিনি তা তুলে ধরেন। স্ট্যালিন দেখান, রাশিয়ার বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চরিত্র নিচ্ছে। এই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বর্তমান সময়ে যে কর্তব্য আরোপ করে, তা হল— উৎপাদন ও বন্টনের উপর শ্রমিকশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা, চাষিদের হাতে জমি তুলে দেওয়া এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর হাত থেকে শ্রমিকশ্রেণী ও দরিদ্র কৃষকসমাজের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা অর্পণ করা।

ষষ্ঠ কংগ্রেসে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বলশেভিক পার্টি। এ জন্য সর্বহারাশ্রেণী ও সবচেয়ে দরিদ্র কৃষকসমাজকে সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ষষ্ঠ কংগ্রেস থেকে যে ইস্তাহারটি প্রকাশিত হয়, তাতে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য, শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের কাছে তাদের সমস্ত শক্তি সংহত করার আহ্বান জানানো হয়।

জেনারেল কর্নিলভের ষড়যন্ত্র

এদিকে রাশিয়ার বুর্জোয়াশ্রেণী দুর্বল হয়ে পড়া সোভিয়েটগুলিকে ধ্বংস করার এবং খোলাখুলি ভাবে প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপ চালানোর প্রস্তুতি নিতে থাকল। সোস্যালিস্ট রেভোলিউশনারি কেরেনস্কি হুমকি দিল যে, জমিদারদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নেওয়ার জন্য চাষিদের বেআইনি প্রচেষ্টা সহ যে কোনও ধরনের বিপ্লবী আন্দোলন কড়া হাতে দমন করা হবে। সেনাধিনায়ক জেনারেল কর্নিলভ অবিলম্বে কমিটি ও সোভিয়েটগুলি ধ্বংস করে দিতে চাইল। ব্যাঙ্কমালিক, ব্যবসায়ী, কারখানা মালিকরা বিপুল অর্থ সাহায্যের অঙ্গীকার করে জেনারেল কর্নিলভের পাশে এসে দাঁড়াল। জোটসঙ্গী ব্রিটেন, ফ্রান্সের প্রতিনিধিরাও জেনারেল কর্নিলভকে সমর্থন করে অবিলম্বে বিপ্লবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার বলে মত প্রকাশ করল।

২৫ আগস্ট 'পিতৃভূমিকে রক্ষা'র নামে কর্নিলভ জেনারেল ক্রাইমভের নেতৃত্বে পেট্রোগ্রাডে সেনা পাঠানোর ব্যবস্থা করে। এই আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে বলশেভিক পার্টি শ্রমিক ও সৈনিকদের সক্রিয় সশস্ত্র প্রতিরোধে নামার ডাক দেয়। শ্রমিকরা অতি দ্রুত প্রতিরোধের জন্য অস্ত্র হাতে তৈরি হতে শুরু করে। দিকে দিকে লালরক্ষীদের অসংখ্য ঘাঁটি গড়ে ওঠে। ট্রেড ইউনিয়নগুলি তাদের সদস্যদের প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক দেয়। পেট্রোগ্রাডের

পাঁচের পাতায় দেখুন

মহান নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা

চারের পাতার পর

বিপ্লবী সামরিকবাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। পেট্রোগ্রাডের চারদিক ঘিরে ট্রেঞ্চ খোঁড়া হয়, কাঁটাতারের দেওয়াল খাড়া করা হয়, শহরের দিকে আসা ট্রেন লাইন কেটে দেওয়া হয়। যেখানেই কর্নিলভের সেনাদের আক্রমণের আশঙ্কা ছিল, সেখানেই বিপ্লবী কমিটি ও বিপ্লবী হেডকোয়ার্টার্স স্থাপন করে বলশেভিক পার্টি।

এই সময়ে নিজেদের সুরক্ষার জন্য মৃত্যুভয়ে ভীত সোস্যালিস্ট রেভোলিউশনারি ও মেনশেভিকরা, যাদের মধ্যে কেরেনস্কিও ছিল, বলশেভিকদের কাছে এসে আশ্রয় চায়। তারা বুঝতে পেরেছিল, একমাত্র বলশেভিকরাই পেট্রোগ্রাডে কর্নিলভকে পরাজিত করার ক্ষমতা ধরে। বলশেভিকরা সেই সময় কর্নিলভের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য জনগণকে সংগঠিত করার সাথে সাথে তাদের কাছে কেরেনস্কি সরকার, মেনশেভিক ও সোস্যালিস্ট রেভোলিউশনারিদের মুখোশ খুলে দেওয়ার কাজও সমানভাবে চালিয়ে গিয়েছিল। তারা ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছিল, এদের সমগ্র কার্যকলাপ ও নীতিগুলি বাস্তবে কর্নিলভের প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রকেই সাহায্য করছে।

এই সমস্ত কিছুর ফল হিসাবে কর্নিলভের আক্রমণ শেষপর্যন্ত প্রতিহত করা গেল। কর্নিলভের এই পরাজয় কয়েকটি বিষয় রুশ জনগণের সামনে স্পষ্ট করে দিল। প্রথমত, বোঝা গেল যে, প্রতিবিপ্লবীদের তুলনায় বিপ্লবীদের শক্তি অধিকতর। কর্নিলভের পরাজয় আরও দেখিয়েছিল, বিপ্লবের নির্ণায়ক শক্তি হিসাবে বলশেভিক পার্টির উত্থান ঘটেছে এবং এই পার্টি প্রতিবিপ্লবের যে কোনও প্রচেষ্টাকে রুখে দেওয়ার মতো ক্ষমতা ধরে। সর্বশেষে, এই পরাজয়ে প্রমাণিত হল, যে সোভিয়েটগুলিকে দুর্বল বলে মনে করা হয়েছিল, বাস্তবে সেগুলির মধ্যে সুপ্ত রয়েছে বিপ্লবী প্রতিরোধশক্তি। সোভিয়েট ও তার বিপ্লবী কমিটিগুলিই যে কর্নিলভের সেনাবাহিনীর পথরোধ করে তাদের শক্তি নিঃশেষিত করেছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই ছিল না।

কর্নিলভের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম নিস্তেজ হয়ে পড়া সোভিয়েটগুলিকে আবার নতুন প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত করে তুলল। এই সংগ্রাম, আপসমুখী দোদুল্যমান মানসিকতা ভুলিয়ে তাদের বিপ্লবী সংগ্রামের খোলা ময়দানে দাঁড় করিয়ে দিল এবং বলশেভিক পার্টির প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়ে তুলল। সোভিয়েটগুলিতে বলশেভিকদের প্রভাব ব্যাপকভাবে বেড়ে গেল। শুধু শহরে নয়, গ্রামীণ জেলাগুলিতেও বলশেভিকদের প্রভাব বাড়ল। ছোট চাষি ও মধ্য চাষিরা দলে দলে বলশেভিক পার্টির প্রতি আকৃষ্ট হল। ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে মালিকদের কাছ থেকে চাষিরা বিপুল পরিমাণ জমি দখল করে নিল। বিপ্লবের স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ এই চাষিদের শান্তি দিয়ে বা অন্য কোনওভাবেই ঠেকিয়ে রাখা গেল না। রাশিয়ায় বিপ্লবের ঢেউ তখন প্রবল হয়ে উঠেছে।

সেই সময় সোভিয়েটগুলিতে নতুন করে মেনশেভিক ও সোস্যালিস্ট রেভোলিউশনারিদের স্থানে বলশেভিক পার্টির প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করার পালা শুরু হয় এবং আবার 'সোভিয়েটের হাতে সমস্ত ক্ষমতা দিতে হবে'— এই স্লোগান ওঠে। এবারের স্লোগানের লক্ষ্য ছিল, অস্থায়ী সরকারকে হঠিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে বলশেভিকদের দ্বারা পরিচালিত সোভিয়েটের হাতে হস্তান্তর করা।

আপসকামী পার্টিগুলির মধ্যেও ভাঙন শুরু হয়। মেনশেভিক ও সোস্যালিস্ট রেভোলিউশনারিদের মধ্য থেকে অনেকেই বলশেভিকদের দিকে চলে আসে।

কর্নিলভের পরাজয়ের পর বিপ্লবের ঢেউ রুখতে মেনশেভিক ও সোস্যালিস্ট রেভোলিউশনারিরা আরও একবার চেষ্টা চালায়। তারা ১৯১৭-র ১২ সেপ্টেম্বর আপসকামী সোভিয়েট, ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদিদের নিয়ে একটি অল রুশ ডেমোক্র্যাটিক কনফারেন্স আহ্বান করে। এই কনফারেন্স একটি প্রাক-সংসদ (পার্লামেন্টের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য প্রাথমিক পরিষদ) গঠন করে। বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি প্রাক-সংসদ বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু কামেনেভ, জিনোভিয়েভ প্রমুখ মেনশেভিকদের সঙ্গে এক সুরে বলতে থাকেন যে, বিপন্ন বুর্জোয়া সরকারকে সহযোগিতা করা প্রয়োজন এবং প্রাক-পার্লামেন্টে যোগ দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু লেনিন দেখালেন, এই কাজের অর্থ দাঁড়াবে জনসাধারণের মধ্যে বুর্জোয়া

বিপ্লবী অভ্যুত্থান

শিল্পী ঃ ভালেন্টিন আলেকজান্দ্রোভিচ সেরভ

সংসদ সম্পর্কে মোহ সৃষ্টি করা এবং বিপ্লবী আকাংখাকে বিপথে পরিচালিত করা।

বলশেভিকরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি নিতে থাকে। অভ্যুত্থানের সময় সেনা ইউনিট, লালরক্ষী বাহিনী এবং নৌবাহিনীর বিপ্লবীরা পেট্রোগ্রাডের কোন কোন স্থান থেকে লড়াই চালাবে ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয়গুলি যুক্ত করে লেনিন একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা গঠন করেন।

৭ অক্টোবর লেনিন অত্যন্ত গোপনে পেট্রোগ্রাডে উপস্থিত হলেন। ১০ অক্টোবর শুরু হল বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক ঐতিহাসিক বৈঠক; সেখানে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই কীভাবে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটানো হবে, তার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল। কেন্দ্রীয় কমিটির দু'জন সদস্য — কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধতা করলেন। মেনশেভিকদের মতো তাঁরাও বুর্জোয়া সংসদীয় প্রজাতন্ত্রের স্বপ্ন দেখছিলেন। শ্রমিকশ্রেণী যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার ক্ষমতা অর্জন করেছে, এই বিশ্বাস তাঁদের ছিল না। ওই বৈঠকেই ট্রটস্কিও অভ্যুত্থানের তারিখ পিছিয়ে দিয়ে সোভিয়েটের দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর তা শুরু করার কথা বললেন।

বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্ট সহ দেশের অন্যান্য স্থানে অভ্যুত্থান সংগঠিত করার জন্য ভোরোশিলভ, মলোটভ, জেরঝিনস্কি, অর্দজোনিকিদ্‌জে, কিরভ, কাগানোভিচ প্রমুখ নেতাদের বিভিন্ন প্রদেশে পাঠাল। পেট্রোগ্রাডে অভ্যুত্থান শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাতে গোটা দেশ জুড়ে তা ছড়িয়ে পড়ে, সেজন্যই এঁদের পাঠানো হয়েছিল। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে পেট্রোগ্রাড সোভিয়েটের একটি বিপ্লবী সামরিক কমিটি গঠিত হল। গোটা অভ্যুত্থানের হেডকোয়ার্টার্স হিসাবে এই কমিটি কাজ করেছিল।

১৬ অক্টোবর কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভা হয়। এই সভায় একটি পার্টি কেন্দ্র নির্বাচন করা হয় এবং কমরেড স্ট্যালিনকে আসন্ন অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য মনোনীত করা হয়। পেট্রোগ্রাড সোভিয়েটের বিপ্লবী সামরিক কমিটির নেতৃত্বদানকারী অংশ ছিল এই পার্টি কেন্দ্রটি এবং গোটা অভ্যুত্থানটি এই পার্টি কেন্দ্রের নির্দেশেই পরিচালিত হয়েছিল। ১৬ অক্টোবরের সভাতেও জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ আবার অভ্যুত্থানের বিরোধিতা করলেন এবং প্রকাশ্যে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে বলশেভিকদের অভ্যুত্থানের পরিকল্পনার কথা ফাঁস করে দিলেন।

এদিকে বিশ্বাসঘাতকদের কাছ থেকে খবর পেয়ে প্রতিবিপ্লবীরা আক্রমণের পরিকল্পনা নিতে শুরু করে। ১৯ অক্টোবর অস্থায়ী সরকার ফ্রন্ট থেকে সৈন্য সরিয়ে এনে পেট্রোগ্রাডে মোতায়েন করে। রাস্তায় রাস্তায় টহলদারি চলতে থাকে। সরকারের পরিকল্পনা ছিল, বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির হেডকোয়ার্টার্স স্মলনি আক্রমণ করে দখল করে নেওয়া।

ইতিমধ্যে, পেট্রোগ্রাড সোভিয়েটের এক বৈঠকে সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু হওয়ার তারিখটি প্রকাশ করে ফেলেন ট্রটস্কি। ফলে বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে ওই নির্দিষ্ট দিনের আগেই অভ্যুত্থান শুরু করার নতুন পরিকল্পনা করতে হয়। তারা ঠিক করে, সোভিয়েটের দ্বিতীয় কংগ্রেস আরম্ভ হওয়ার আগের দিনই সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু করা হবে।

দুনিয়া কাঁপানো দিনগুলি

২৪ অক্টোবর (নতুন ক্যালেন্ডারে ৬ নভেম্বর) ভোরে বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'রাবোচি পুত' (শ্রমিকদের পথ)-কে বন্ধ করে দিয়ে এবং পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তর ও প্রেসে সাঁজোয়া গাড়ি মোতায়েন করে কেরেনস্কি সরকার আক্রমণের সূচনা ঘটাল। যদিও স্ট্যালিনের নির্দেশে লালরক্ষীবাহিনী ও বিপ্লবী সেনারা সাঁজোয়া গাড়িগুলিকে হঠিয়ে দেয়। ওইদিন বেলা ১১টা নাগাদ অস্থায়ী সরকারকে ক্ষমতা থেকে ছুঁড়ে ফেলার আহ্বান জানিয়ে রাবোচি পুত প্রকাশিত হল। একই সঙ্গে পার্টি কেন্দ্রের নির্দেশে বিপ্লবী সেনাদের গ্রুপগুলি ও লালরক্ষীরা স্মলনির দিকে ছুটে গেল। শুরু হয়ে গেল অভ্যুত্থান। ওইদিন রাতেই লেনিন স্মলনিতে পৌঁছলেন এবং নিজে উপস্থিত থেকে অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিলেন। সারা রাত ধরে বিপ্লবী সেনারা স্মলনিতে আসতে লাগল। বলশেভিকরা তাদের পাঠিয়ে দিল শীতপ্রাসাদ ঘিরে ফেলতে। ওই শীতপ্রাসাদেই অস্থায়ী সরকারের কর্তারা আশ্রয় নিয়েছিল।

২৫ অক্টোবর (নতুন ক্যালেন্ডারের ৭ নভেম্বর) বিপ্লবীবাহিনী রেলস্টেশন, পোস্টঅফিস, টেলিগ্রাফ অফিস, মন্ত্রীদের দপ্তর ও স্টেট ব্যাঙ্ক দখল করে নিল। প্রাক-পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়া হল। স্মলনি হয়ে উঠল বিপ্লবের হেডকোয়ার্টার্স। এই সময়ে লালরক্ষীবাহিনীর পাশাপাশি পেট্রোগ্রাডের শ্রমিকরা বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে অসামান্য বীরত্বের নিদর্শন রেখেছিল। নৌবাহিনীও পিছিয়ে ছিল না। যুদ্ধজাহাজ 'অরোরা' শীতপ্রাসাদের দিকে তার অস্ত্র ঘুরিয়ে ধরেছিল।

ওই দিন অর্থাৎ ২৫ অক্টোবর বলশেভিকরা রাশিয়ার জনসাধারণের উদ্দেশে একটি ইস্তাহার বিলি করে জানাল, বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকারকে উচ্ছেদ করে সোভিয়েট রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে। ওই দিন রাতে বিপ্লবী শ্রমিক, সৈনিক ও নাবিকরা শীতপ্রাসাদে অভিযান চালিয়ে অস্থায়ী সরকারের সদস্যদের গ্রেপ্তার করল। বলশেভিকরা পেট্রোগ্রাডের সশস্ত্র অভ্যুত্থানে বিজয়ী হল। রাজধানীর শাসনক্ষমতা চলে এল পেট্রোগ্রাড সোভিয়েটের হাতে।

রাশিয়ায় গঠিত হল এক নতুন ধরনের রাষ্ট্র — সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রাষ্ট্র। জমির উপর থেকে জমিদারদের নিয়ন্ত্রণ বাতিল করে চাষিদের হাতে তা তুলে দেওয়া হল। সমস্ত জমি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হল। পুঁজিপতিদের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হল। যুদ্ধ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে সোভিয়েট রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে সর্বশক্তি নিয়োগ করল।

নভেম্বরের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পুঁজিবাদ ধ্বংস করে পুঁজিপতিদের হাত থেকে উৎপাদনের উপকরণগুলি কেড়ে নিল এবং সমস্ত কল-কারখানা, জমি, রেলওয়ে এবং ব্যাঙ্কগুলিকে জনগণের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করে তুলে দেওয়া হল দেশের মেহনতি সাধারণ মানুষের হাতে।

নভেম্বর বিপ্লব রাশিয়ায় সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব কায়েম করল এবং এই বিশাল দেশের শাসনভার শ্রমিকশ্রেণীর উপর তুলে দিয়ে তাদেরই শাসকশ্রেণীতে পরিণত করল।

এইভাবেই নভেম্বর বিপ্লব মানবসভ্যতার ইতিহাসে সৃষ্টি করল এক নতুন যুগ — সর্বহারা বিপ্লবের যুগ।

সি এইচ জি কর্মীদের বিক্ষোভ

২৩ ডিসেম্বর পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত দুই সহস্রাধিক সিএইচজি, টিডি, ওয়াটার ক্যারিয়ার, সুইপার প্রভৃতি কর্মচারীদের উপযুক্ত বেতন, ডিএ, বোনাস, পিএফ, গ্র্যাচুইটি, পেনশন সহ নিয়মিত কর্মচারীর মর্যাদার দাবিতে মেট্রো চ্যানেলে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি দেন। স্মারকলিপি গ্রহণ করেন অর্থমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেপিএ-র সহসভাপতি বিমল জানা। বিভিন্ন জেলার কর্মচারীরা বক্তব্য রাখেন। এ ছাড়াও সাগর মোদক, দিলীপ চক্রবর্তী, প্রবীর দে, মধু বেরা, আবদুস সালাম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। তাঁরা বলেন, দাবি আদায় না হলে লাগাতার ভাবে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য হবেন।

ফ্যাশান শো স্থগিত চিত্তরঞ্জনে

বর্ধমান জেলার চিত্তরঞ্জনের রবীন্দ্র মঞ্চে 'ফ্যাশান শো'র আয়োজন করেছিল ওখানকার একটি সংস্থা। এই কুরুচিপূর্ণ শো বন্ধ করার দাবিতে আন্দোলনে নামেন এ আই এম এস-এর উদ্যোগে স্থানীয় মহিলারা। পরে যোগ দেয় এ আই ডি এস ও এবং এ আই ডি ওয়াই ও-র উদ্যোগে ছাত্র-যুবরা। গোটা এলাকা জুড়ে ব্যাপক পোস্টারিং করা হয়, আমলাদহি বাজার সহ বহু স্থানে পথসভার মধ্য দিয়ে জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়। ৩০ ডিসেম্বর মিছিল করে সি এল ডব্লিউ পুলিশ থানায় গিয়ে শো বন্ধ করার দাবি জানানো হয়। ও সি ডেপুটেশন গ্রহণ করে শো বন্ধ করার ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান। জনগণের বিরুদ্ধতা বুঝতে পেরে শো'র আয়োজকরা কিছু জায়গায় প্রচারের হোর্ডিং খুলে নিলেও মতলব ছাড়েনি বলেই মানুষের ধারণা। এ ধরনের ফ্যাশান শো'র প্রতিবাদে একটি নাগরিক কনভেনশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

হরিপুরে পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প

একের পাতার পর

একমত নন। তাঁদের অভিমত হল, কয়লা বা তেল যা মজুত আছে, তা দিয়ে আরও ৩৬০ বছর চলবে। আবার পরমাণু বিদ্যুৎ তৈরিতে যে ইউরেনিয়াম লাগে বিশ্বে সেই ইউরেনিয়ামের মজুত ভাণ্ডারও বেশি নয়। আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার ২০০৪ সালের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বে মোট ইউরেনিয়াম আছে ১.৪৪ কোটি টন। কিন্তু অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনকভাবে ব্যবহারযোগ্য ইউরেনিয়ামের পরিমাণ হল মাত্র ৩৫ লক্ষ টন। বর্তমানে বিশ্বে বছরে ৬৭,০০০ টন ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা হয়। ইউরেনিয়ামের খরচ যদি আর না বাড়িয়ে একইভাবে চলে তবে মজুত ভাণ্ডার দিয়ে আর মাত্র ৫২.২৩ বছর চলতে পারে। ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি হিসাবে ইউরেনিয়াম কখনই কয়লা ও তেলের বিকল্প হতে পারে না।

এক সময়ে ভাবা হয়েছিল পরমাণু শক্তিকে কাজে লাগিয়েই বিদ্যুৎ সরবরাহের সমস্যাটা চিরতরে সমাধান হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে এই কাজে বিপুল ব্যয়ও হয়ে গিয়েছে। মাত্র ৫০ বছরে বিপুল বিনিয়োগ সত্ত্বেও পরমাণু বিদ্যুতের প্রসার খুব বেশি ঘটছে না। বরং বলা ভাল যে, এই শিল্প আজ রুগ্ন। ১৯৯৯ সালে ওয়ার্ল্ড এনার্জি এ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট থেকে পাওয়া এক তথ্যে দেখা যাচ্ছে, বিশ্বে মোট বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ শক্তির ৩৩.৩ শতাংশ এসেছে তেল থেকে, ২২.৫ শতাংশ কয়লা থেকে, ১৯.৪ শতাংশ প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে, ১৮.৭ শতাংশ নবীকরণযোগ্য উৎস থেকে, ১১.৯ শতাংশ জৈব ভর থেকে, ৬.৮ শতাংশ জল থেকে এবং মাত্র ৬.১ শতাংশ এসেছে পরমাণু থেকে। দীর্ঘ সময়েও পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন নবীকরণযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। বরং, বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের সম্মিলিত একমুখী উদ্যোগ এবং রাষ্ট্রীয় নেতাদের রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে নবীকরণযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়িয়ে বিদ্যুতের জোগান এমন স্তরে নিয়ে যাওয়া যেত যাতে পরমাণু বিদ্যুতের মত ব্যয়বহুল ও বিপজ্জনক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পদ্ধতি অনুসরণ করার প্রয়োজনই থাকত না।

পরমাণু বিদ্যুৎ সস্তা নয়

পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন সস্তা বলে যে দাবি করা হচ্ছে, তা কি আদৌ বাস্তবসম্মত? হিসাবে দেখানো হয়, কয়লা থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের দাম পরমাণু বিদ্যুতের থেকে দ্বিগুণ। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে সরকার বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে। পরমাণু বিদ্যুতের দাম সস্তা রাখতে আমেরিকার মতো দেশে বেসরকারি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিকে সরকার বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি দেয়। আমেরিকায় ব্যক্তিগত মালিকানায় ১০৪টি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতি বছর সরকারি কোষাগার থেকে ভর্তুকি পেয়ে থাকে ১৩০ মিলিয়ন ডলার। সরকারের এই খরচের সাথে আছে আরও আনুষঙ্গিক ব্যয়। যেমন, গবেষণার ব্যয়, উপযুক্ত সতর্কতা ও নিরাপত্তার সাথে ইউরেনিয়াম পরিবহন ও সংরক্ষণের ব্যয়, তেজস্ক্রিয় বর্জ্য সংরক্ষণের ব্যয়, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যয়, দুর্ঘটনা হলে তার দায়দায়িত্বজনিত ব্যয়, বিকিরণের কারণে স্বাস্থ্যহানি সংক্রান্ত সমস্যায় চিকিৎসার ব্যয়, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কার্যকারিতার মেয়াদ মাত্র ৪০-৪৫ বছর, মেয়াদের শেষে ডিকমিশনিং-এর ব্যয় প্রভৃতি এই সঙ্গে ধরা হলে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় কী বিপুল হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

উন্নত দেশগুলি পরমাণু বিদ্যুতের ব্যবহার কমাচ্ছে

উন্নত দেশগুলো এখন পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন কমাবার দিকে পা বাড়িয়েছে। তাদের পরিত্যক্ত প্রযুক্তি ভারতে আমদানি করা হচ্ছে। পরমাণু চুল্লির প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতার বিরুদ্ধে পশ্চিমী দুনিয়ার জনমত প্রবল হয়ে উঠছে। সুইডেনের নাগরিকরা ২০১০ সালের মধ্যে সে দেশের সমস্ত পরমাণু চুল্লি বন্ধ করে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে। জার্মানির পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০০১ সালে যেখানে ২১ গিগাওয়াট ছিল, সেখানে সেদেশের সরকার ২০১৫ সালে তা ১৩ গিগাওয়াটে নামিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্রিটেনের পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০০১ সালে ২১ গিগাওয়াট ছিল, সেখান থেকে কমিয়ে ২০২৫ সালে ৪ গিগাওয়াট করা হবে বলে সরকার স্থির করেছে। ফ্রান্সে এই শিল্প প্রবল আর্থিক সঙ্কটে পড়েছে। বিশ্বে যখন দ্রুতহারে পরমাণু বিদ্যুৎ শিল্প হ্রাস করা হচ্ছে, তখন তাদের সেই পরিত্যক্ত পরমাণু বিদ্যুৎ শিল্প স্থাপনে ভারত সরকার আগ্রহী কার স্বার্থে?

তেজস্ক্রিয় দূষণ ছড়ায়

পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে তেজস্ক্রিয় দূষণের পরিণাম অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। ইউরেনিয়াম আকরিক থেকে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জ্বালানি হিসাবে ইউরেনিয়াম-২৩৫ পাওয়া যায় খুবই কম। এক টন ইউরেনিয়াম অক্সাইড থেকে ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় মাত্র ২০ গ্রাম। বাকিটা অর্থাৎ প্রায় এক টনই বর্জ্য। প্রতি টন আকরিক থেকে মাত্র ২০ গ্রাম জ্বালানিযোগ্য ইউরেনিয়াম বের করা ব্যয়বহুল ও বিপজ্জনক। আবার যে বিপুল পরিমাণ বর্জ্য পড়ে থাকে তাও মারাত্মক তেজস্ক্রিয় ও বিপজ্জনক। পরমাণু চুল্লির পক্ষে যাঁরা যুক্তি দিচ্ছেন, তাঁরা এই তেজস্ক্রিয় বর্জ্য নিয়ে আশ্চর্যজনকভাবে নীরব। পরমাণু কেন্দ্রে যখন বিদারণ প্রক্রিয়া চলে তখন ২০০ ধরনের তীব্র তেজস্ক্রিয় পদার্থ বের হয়, ফলে পরমাণু কেন্দ্রের রিঅ্যাক্টরের অভ্যন্তর তখন তীব্র তেজস্ক্রিয় হয়ে ওঠে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ১০০০ মেগাওয়াট পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দীর্ঘ কালব্যাপী তেজস্ক্রিয় বিকিরণের পরিমাণ হিরোসিমায় ফেলা বোমার মত ১০০০টি বোমার তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সমান। হাজার হাজার বছর পরও এই তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলির বিকিরণক্ষমতা থেকে যায়। খুব সামান্য পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থের সংস্পর্শে এলেই ক্যান্সার সহ বহু দুরারোগ্য রোগের আক্রমণ ঘটে, প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়, এমনকী মায়ের গর্ভের শিশুও বিকলাঙ্গ হয়। এই তেজস্ক্রিয়তা চোখে দেখা যায় না বা সহজে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। এই দূষণের প্রতিকার প্রায় অসম্ভব। উপযুক্ত প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা না থাকলে জল, বায়ু, খাদ্য সবকিছুর মধ্য দিয়ে তেজস্ক্রিয় পদার্থ মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি যদি স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতে চলেও, তবুও এ যে জটিল লাগাতার বিক্রিয়ায় (চেইন রিঅ্যাকশন) চলে, তাতে পার্শ্ববর্তী পরিবেশে যথেষ্ট পরিমাণ বিকিরণ ঘটে। পরমাণু কেন্দ্র থেকে মাঝে মাঝে তেজস্ক্রিয় গ্যাস নির্গত হয়। তেজস্ক্রিয় শীতল জলও মাঝে মাঝে পার্শ্ববর্তী নদী বা সমুদ্রে (বোধকরি সেই কারণেই নদী বা সমুদ্রের ধারে পরমাণু কেন্দ্রগুলি স্থাপন করা হয়ে থাকে) ফেলা হয়। এইভাবে পরিবেশে এবং শেষ পর্যন্ত তা খাদ্যের মধ্য দিয়ে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। ইউরেনিয়াম খনির আকরিক থেকে হাজার হাজার টন তেজস্ক্রিয় বর্জ্য খনির আশেপাশে পড়ে থাকে, যা বায়ু, জল, মাটিকে দূষিত করছে।

অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, পরমাণু গবেষণার এত অগ্রগতির কোনও সুযোগ কি মানব সভ্যতার কাজে লাগানো হবে না? প্রতিটি গবেষণার সুফল কাজে লাগিয়েই সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতি ঘটেছে। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না। চিকিৎসা সহ বিভিন্ন কাজে পরমাণু শক্তি ও তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যবহার তো হচ্ছেই। সে ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন আসে না। বিজ্ঞানকে মানব কল্যাণে ব্যবহার করা নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই। কিন্তু বিজ্ঞানকে ব্যবহারের নামে মুনাফা করতে গিয়ে সমাজের ক্ষতি কখনওই মেনে নেওয়া যায় না।

পরমাণু বিদ্যুৎ নিরাপদ নয়

সরকারি মন্ত্রী ও 'বিশেষজ্ঞরা' পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনকে যতই নিরাপদ বলুন না কেন, প্রতিদিনই বিশ্বের কোনও না কোনও পরমাণু চুল্লিতে দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। ১৯৮৬ সালের জুন মাসে কলকাতার সোভিয়েত দূতাবাস থেকে প্রকাশিত বুলেটিন থেকে জানা যায়, ১৯৭১ - '৮৬ সালের মধ্যে ১৪টি দেশে ১৫১টি বড় বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে। ১৯৭৬ সালে পশ্চিম জার্মানিতে ১৩৯টি দুর্ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। আমেরিকার একটি সংস্থার রিপোর্টের মতে, সে দেশের বাণিজ্যিক পরমাণু কেন্দ্রগুলিতে ১৯৮৬ সালে ২৮৩৬টি এবং পরের বছর ২৮১০টি দুর্ঘটনা ঘটেছিল।...ভারতের পরমাণু বিশেষজ্ঞ বীরেন্দ্র শর্মা ১৯৮৯ সালে বলেছিলেন, 'ভারতের পরমাণু কেন্দ্রগুলিতে কমপক্ষে ৩০০টি ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। এর ফলে তিন হাজারেরও বেশি ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মী সে সময় তেজস্ক্রিয়তার শিকার হন।' (দৈনিক স্টেটসম্যান ৫-১২-০৬)

বিপুল সংখ্যক মানুষ উচ্ছেদ হবেন

এ হেন ব্যয়বহুল, বিপজ্জনক, দুর্ঘটনাপ্রবণ পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের স্থান হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে সমুদ্র উপকূলবর্তী জুনপুট সংলগ্ন জনবহুল হরিপুরকে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি ১নং ব্লক এবং রামনগর ২নং ব্লকের ৬২টি মৌজা নিয়ে হরিপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করতে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার উদ্যোগী হয়েছে। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হলে প্রায় দুই লক্ষাধিক মানুষ উৎখাত হবেন। এই সর্বনাশা প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এখানে ১০১৩ একর জমি অধিগ্রহণ করবে। এ ছাড়া পরমাণু চুল্লির যে এলাকাকে 'বাফার জোন' বা 'এক্সক্লুসিভ জোন' বলা হয়, সেটি ভারতের শক্তি মন্ত্রকের মতে ১.৬ কিমি ব্যাসার্ধের একটি এলাকা বুঝিয়ে থাকে। সেই এলাকায় মানুষের বসবাস থাকবে না। হরিপুরে ১৬৫০ মেগাওয়াটের ৬টি রিঅ্যাক্টর বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে। এর জন্য কমপক্ষে ২.৪ কিমি ব্যাসের এলাকা প্রয়োজন। এরপর ৫ কিমি ব্যাসার্ধের এলাকা থেকে বসতি কমিয়ে ১০ হাজার জনসংখ্যার এবং তারপরের ১০ কিমি ব্যাসার্ধের এলাকায় জনসংখ্যা কমিয়ে ২০ হাজারে নামিয়ে আনতে হবে। এর ফলে বাস্তবে কাঁথি মহকুমা শহরের অস্তিত্বই থাকবে না, যেখানে বাস করে ৭৮ হাজার মানুষ। উচ্ছেদের এই ব্যবস্থা কার্যকর হলে, এই এলাকার উর্বর কৃষি জমিতে ধান, পান, সবজি চাষ আর হবে না। এখানে রয়েছে ১৭টি মাছের খটি, যেখানে ৫০ হাজার মৎস্যজীবী পরিবার তাদের মাছ ধরা ও বিক্রি করা, শুঁটকি করা, ট্রাকের সাহায্যে চালান করার কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করে। এই এলাকায় আছে ৪০টির বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৭টি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শাখা অফিস, ২টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৬টি বাজারের ৬০০-র বেশি স্থায়ী দোকান এবং ১০০০-র বেশি অস্থায়ী দোকান। এগুলিরও অস্তিত্ব থাকবে না। এ ছাড়া কাঁথি থেকে শৌলা এবং কাঁথি থেকে জুনপুট রাস্তার সমস্ত বাসস্টপে স্থায়ী-অস্থায়ী দোকানগুলি আর থাকবে না। বাস্তবে একটি আস্ত জনপদ বিলুপ্ত হয়ে যাবে, গড়ে উঠবে তেজস্ক্রিয় দূষণের বিপজ্জনক পারমাণবিক বিদ্যুৎ চুল্লি।

শিল্প হলে কর্মসংস্থানের আশায় বহু মানুষ ভিটেমাটি ছেড়ে দেয়। এ ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা কতটুকু? এত বিপুল ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে যে পরমাণু চুল্লি বসানো হচ্ছে, সেখান থেকে যত সংখ্যক মানুষ উৎখাত হবেন, তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হবে এমন কোনও সংবাদ জানা নেই। যে বিপুল সংখ্যক মানুষ জীবিকা হারাবেন, তাদেরও কর্মসংস্থানের দায়িত্ব দেশের সরকার নেবে — এ কথা বলা পাগলের প্রলাপ মাত্র। উৎখাত হওয়া স্থানীয় মানুষ জীবিকা নির্বাহের জন্য পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কাজ পাবে এমন সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ। প্রথমত পরমাণু বিদ্যুৎ শিল্প শ্রমনিবিড় শিল্প নয়। এখানকার কাজ বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত লোকদের জন্য। পুনর্বাসন হবে না, কর্মসংস্থান হবে না, উপরন্তু এই বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক। এ সব জেনেও সাধারণ মানুষ ভিটেমাটি ছাড়তে চাইবে কেন?

পরমাণু চুল্লি নির্মাণের প্রত্যক্ষ প্রভাবে ভিটে-মাটি, জীবন-জীবিকা হারাবে যত মানুষ, তেজস্ক্রিয় বিকিরণের কারণে পরিবেশ দূষণের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার বহু গুণ বেশি মানুষ। এই এলাকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য বিস্তীর্ণ এলাকায় যে ঝাউবন আছে তাও অবলুপ্ত হয়ে যাবে। সমুদ্রের জল দূষিত হবে। তার ফলে মাছের উৎপাদন কমে যাবে, এমনকী পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা দূষণের ফলে বড় বড় গাছপালা ও গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ যা প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে, তা ধ্বংস হয়ে যাবে। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় কেবল মেদিনীপুর জেলার ক্ষেত্রে ঘটবে না, ঘটবে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ক্ষেত্রেও। সারা বিশ্বে যেসব বনভূমি সংরক্ষিত হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে, সুন্দরবন তার অন্যতম। ম্যানগ্রোভ এই এলাকার মূল্যবান বনসম্পদ, তা ধ্বংস হবে। সেই কারণে ইতিপূর্বে দক্ষিণ ২৪ পরগণার মানুষ দীর্ঘ আন্দোলন করে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের চেষ্টাকে বাতিল করতে বাধ্য করেছে।

পরমাণু শক্তিধর হওয়াই উদ্দেশ্য

এত ধরনের বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে যে পরমাণু চুল্লি, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিজ্ঞানী ও পরিবেশবিদদের, সর্বোপরি জনগণের প্রতিবাদ সত্ত্বেও সেই চুল্লি স্থাপনে এত মরিয়া কেন? দুই সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা এর উত্তর গোপন করলেও জনসাধারণকে তা খুঁজে বের করতে হবে। দেশের নেতারা যখন জাতীয় স্বার্থের কথা বলেন, তা যে নির্ভেজাল দেশের স্বার্থ বোঝায় না, অভিজ্ঞতা থেকেই তা বোঝা যায়। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে দেশের সকল মানুষের স্বার্থও এক নয়। শত সহস্র শহিদের রক্তে রাঙা স্বাধীনতার সমস্ত সুফল আজ দেশের পুঁজিপতিদের কুক্ষিগত। পুঁজিপতিদের স্বার্থকেই আজ 'দেশের স্বার্থ' বলে চালাতে চায় তাদেরই রাজনৈতিক প্রতিভূ ক্ষমতাসীন দলের নেতা-মন্ত্রীরা। এই সমস্ত নেতা-মন্ত্রীদের ব্যবস্থাপনায় দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ সবই এখন একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কুক্ষিগত। তবুও তাদের মুনাফার খিদে মিটছে না। পুঁজির শোষণে দেশের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা আজ নিঃশেষিত। তাই ভারতের পুঁজি এখন অন্য দেশের জনগণের দিকে শোষণের থাবা বিস্তার করেছে। এ কাজে তাদের রাজনৈতিক ম্যানেজারেরা অত্যন্ত তৎপর। একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মুনাফার স্বার্থে ভারতকে রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তিতে এশিয়ার সুপার পাওয়ার হতে হবে। এবং তা মিলিটারি তাকত ছাড়া সম্ভব নয়। তাই মিলিটারি বাজেট বৃদ্ধি হচ্ছে বিপুল হারে। পারমাণবিক বিদ্যুৎ তৈরির কেন্দ্রগুলি আসলে 'প্লুটোনিয়াম' উৎপাদন কেন্দ্র। এই প্লুটোনিয়াম হল পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির মশলা। ভারত পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির অন্যতম। পরমাণু শক্তিতে তাকে আরও শক্তিশালী হতে হবে। এই প্রয়োজনেই আরও পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র চাই। যুদ্ধ এবং অস্ত্রের দাপটে উপমহাদেশে

সাতের পাতায় দেখুন

তিনের পাতার পর

দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত আন্তর্জাতিক দলিল

সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় কেন ঘটল

প্রসঙ্গে, নির্বাচিত রচনাবলী, খণ্ড ১, পৃঃ ৩০৪-৩০৫) তিনি বলেছেন ''আমরা মনে করি, কমিউনিস্টদের ব্যাপক অংশের চেতনার নিম্নমানই এই সমস্ত ভুলের কারণ। একথা সত্য যে, লেনিন পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক এবং পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সাংগঠনিক দিক থেকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিরাট অগ্রগতি ঘটেছে। কিন্তু এই অগ্রগতিটা ঘটেছে বলেই প্রমাণ হয়ে যায় না যে, কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাংগঠনিক অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আদর্শগত চেতনার মানও তেমন উন্নত স্তরে পৌঁছাতে পেরেছে। বাস্তবে তা যে উন্নীত হয় নি, আগে যেসব ত্রুটির কথা আমরা বলে এলাম সেগুলি নিশ্চিতভাবে তারই প্রমাণ। এই যে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাংগঠনিক অগ্রগতি ঘটে গেল অথচ তা সত্ত্বেও তার চেতনার মানটা পিছিয়ে পড়ল — এ আজ নতুন ঘটছে এমন নয়। লেনিন তাঁর জীবদ্দশায় নিজেই এই দিকটার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। সাধারণভাবে কমিউনিস্টদের চেতনার মান আজ যে ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে, আমাদের মতে, প্রধানত, তার কারণ দুটো। প্রথমত, লেনিন পরবর্তীকালে মানবজীবনে এবং শ্রেণীসংগ্রামের সামনে যে বহু নূতন নূতন সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় যে বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসবাদ লেনিনবাদের দর্শনগত উপলব্ধির যে বিকাশ ঘটানো উচিত ছিল, লেনিনের পর তা আর করা হয়নি। এই না করাটার পিছনে অনেক কারণ থাকতে পারে, কিন্তু করা যে হয়নি এটা সত্য। একটা সাধারণ উদাহরণ দিলেই বিষয়টি বোঝা যাবে। একথা বোধহয় কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না যে, আদর্শগত দিক থেকে ব্যক্তিবাদ এবং স্বাধীনতা সম্পর্কে বুর্জোয়া ধারণা আজ অগ্রসর দেশগুলিতে শ্রেণী সংগ্রামের বিকাশের পথে একটা বাধা। এই পরিস্থিতিতে, মানবতাবাদী মূল্যবোধ এবং সর্বহারা মূল্যবোধের একটা তুলনামূলক বিশ্লেষণ তুলে ধরা জরুরি প্রয়োজন ছিল। কিন্তু লেনিন-পরবর্তীকালে এই সমস্যা নিয়ে সমস্ত দিক থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এমন কোন প্রামাণ্য (অথরিটেটিভ) রচনা আমরা দেখিনি। যে হাজার হাজার তরুণ কমিউনিস্ট সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রবাহে নিজেদের যুক্ত করেছে, তাদের আদর্শগত চেতনার মান ক্রমাগত উন্নত থেকে উন্নততর স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য দলের অভ্যন্তরে নিরন্তর আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজটিকে, প্রায় সকল কমিউনিস্ট নেতাই গুরুতরভাবে অবহেলা করেছেন এবং গল্পের একচক্ষু হরিণের মতো কর্মীদের শুধুমাত্র সাংগঠনিক কর্মকান্ডে নিযুক্ত করে রেখেছেন''। (সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির স্ট্যালিনবিরোধী পদক্ষেপ প্রসঙ্গে , নির্বাচিত রচনাবলী, খণ্ড ১, পৃঃ ৭৭-৭৮) আধুনিক শোধনবাদের শ্রেণী চরিত্র নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি এটাকে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে বুর্জোয়া চিন্তাধারার ধারাবাহিকতা বলেই চিহ্নিত করেছেন। আবার বলেছেন, ''বুর্জোয়া মানবতাবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদ যা সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের মৌলিক বিরোধী, চিন্তার ক্ষেত্রে তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবই সাম্যবাদী আন্দোলনে সকলরকম সংশোধনবাদী ও সংস্কারবাদী বিচ্যুতি দেখা দেওয়ার মূল কারণ।'' (ইমরে নেগি, নির্বাচিত রচনাবলী, খণ্ড - ১)

সকলেই ভালভাবে জানেন, সাম্যবাদের ঘৃণ্যতম শত্রু আধুনিক শোধনবাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন করতে গিয়ে মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ঐতিহাসিক সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা করে।

এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি সমগ্র বিশ্বের কমিউনিস্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, ''...এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে ব্যক্তিবাদ নেতা ও কর্মীদের পুঁজিবাদী রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছে, বুর্জোয়া ভাবধারার শিকারে পরিণত করছে, যারা বুরোক্রেটিক আচরণ করছে, যারা আচরণের মধ্যে অর্থনীতিবাদের ঝোঁককে প্রতিফলিত করছে, যারা সংশোধনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে চলেছে, সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যারা সর্বহারা বিপ্লবী রাজনীতির চেতনার ভিত্তিতে ঐক্যের চেয়ে অস্ত্রশস্ত্রের আধুনিকীকরণের ওপর জোর দিচ্ছে — সেইগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, তাকে দূর করা। এইগুলিকে দূর করে জনতাকে তার থেকে মুক্ত করে বর্তমানে চীনের মূল সমস্যাগুলোর সামনে এবং সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে যাতে চীনের জনসাধারণ 'এক মানুষ' হিসাবে দাঁড়াতে পারে, তেমন অবস্থার সৃষ্টি করা। এখনকার মত এই কাজগুলি করতে পারলেই বর্তমান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আশু উদ্দেশ্য সাধিত হবে। কিন্তু, ভবিষ্যতে পার্টির মধ্যে পুনরায় সংশোধনবাদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার সম্ভাবনা থেকে পার্টির সম্পূর্ণ মুক্ত করা বর্তমান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের যে কর্মসূচি রয়েছে, তার দ্বারা সম্ভব হবে না। কারণ, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তির মুক্তিসংগ্রাম যে নতুন জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, সেই সম্পর্কে এই তত্ত্বটাই তাঁরা সঠিকভাবে এখন পর্যন্ত ধরতে পারেননি এবং অন্তত পার্টির মধ্যে কমিউনিস্ট কর্মীদের সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধে অনুপ্রাণিত করার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার সংগ্রামে এই তত্ত্বটাকে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মূল কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে আজও সংযোজিত করতে পারেননি। উপরোক্ত তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশজোড়া সংগ্রাম ও নৈতিকতার আন্দোলন শুরু করতে পারলেই, এই উপলব্ধি আসা সম্ভব যে, এই পথেই ব্যক্তির যথার্থ মুক্তি। বর্তমান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের এই একটা মৌলিক দুর্বলতা''। (ঐ, পৃঃ ২৪৬)

এই সমস্যার জটিল দিকটি বিশদভাবে তুলে ধরতে গিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ অতীব গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই দুটি হ'ল সমাজতান্ত্রিক সমাজে উদ্ভূত একটি নতুন ধরণের 'অর্থনীতিবাদ' ও একটি নতুন ধরনের 'ব্যক্তিবাদ'। তিনি বলেছেন, ''সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পর্বে সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে একটি নতুন ধরনের অর্থনীতিবাদের ঝোঁক, মেটিরিয়াল ইনসেনটিভ এবং বেনিফিট-এর প্রতি লোভ — এই ধরনের বিপদ জাগ্রত হতে পারে। বিপ্লব পরবর্তী পর্বে আন্তর্জাতিক সর্বহারা বিপ্লবের সৈনিক হিসাবে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়ার প্রশ্নে এই 'অর্থনীতিবাদ' শ্রমিকদের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করে, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতায় বাধা সৃষ্টি করে এবং সম্পূর্ণ নিষ্ঠা এবং ত্যাগের মনোভাব, যা ব্যক্তিমুক্তি, অগ্রগতি ও বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য, তাকেই বিনষ্ট করে। ... ফলে একজন শ্রমিকের অধিকতর উৎপাদনের আকাঙ্ক্ষার পিছনে তার সুবিধাভোগী মনে এক মেটিরিয়াল ইনসেনটিভ-এর বাসনাই আসলে কাজ করে যা সমাজতন্ত্রের মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংগতিহীন মানসিকতারই প্রতিফলন। এই মানসিকতা শ্রমিকদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ধাঁচের ব্যক্তিবাদী এবং সুবিধাভোগী ধারার জন্ম দেয়, ... আজকের দিনে সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং নিতান্তই ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানসিক গঠনের পুরনো বুর্জোয়া ধারণাই আজকের নতুন স্তরে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও মুক্তির যে নতুন সংগ্রাম, তাতে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ...সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই অর্থনীতিবাদ-ব্যক্তিবাদকেই আমি নামকরণ করেছি 'সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদ'। আমরা দেখতে পাচ্ছি, ব্যক্তির মুক্তির সংগ্রাম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এক নতুন জটিল স্তরে এসে পৌঁছেছে এবং এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে— যেখানে এই সমস্যাকে সমাধান করতে হলে নিয়ত সাধনা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিস্বার্থকে সামাজিক স্বার্থের সাথে বিলীন করে দেওয়ার জন্য আরও শক্তিশালী কঠোর সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। ...চীনের নেতৃবৃন্দ ব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে মূল সমস্যাটি ধরার ক্ষেত্রে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়েছেন বলে আমার ধারণা। কিন্তু পরিষ্কার তত্ত্বগত ভিত্তির ওপর তাকে দাঁড় করাতে তাঁরা এখনও সক্ষম হননি। ... সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় সংগ্রাম পরিচালনার মধ্যে ব্যক্তির স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম পরিচালনার প্রধান লক্ষ্য হবে— ব্যক্তির প্রয়োজনের সঙ্গে সামাজিক প্রয়োজনের দ্বন্দ্বের যে অ্যান্টাগনিস্টিক (বিরোধাত্মক) চরিত্র রয়েছে, তাকে নন-অ্যান্টাগনিস্টিক (মিলনাত্মক) চরিত্রে রূপান্তরিত করা।''(ঐ, পৃঃ ২৪৪)

এইভাবে সঠিক মার্কসবাদী প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কমরেড ঘোষ শুধুমাত্র এই সমস্যার মূল কারণটি ধরিয়ে দেননি, সেই সাথে সুস্পষ্টভাবে ধরিয়ে দিয়েছেন যে, ''এই সমস্যাকে মোকাবিলা ও পরাস্ত করতে হলে নিয়ত সাধনা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিস্বার্থকে সামাজিক স্বার্থের সাথে বিলীন করে দেবার জন্য আরও শক্তিশালী কঠোর সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে।''(ঐ, পৃঃ ২৪৪)

আজকের দিনে আধুনিক সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, শক্তিশালী কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলা এবং সমাজতান্ত্রিক দেশে প্রতিবিপ্লবকে প্রতিহত করার প্রশ্নে কমরেড শিবদাস ঘোষের এই শিক্ষাগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তাই আধুনিক সংশোধনবাদকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করে পৃথিবীর সর্বত্র কমিউনিস্ট আন্দোলনের পুনর্জাগরণ এবং বিশেষত বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করার জন্য মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুংয়ের বৈপ্লবিক শিক্ষাবলীর ধারাবাহিকতায় তাঁদের সুযোগ্য উত্তর সাধক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার সঠিক উপলব্ধির ওপর নির্ভর করছে আধুনিক সংশোধনবাদের সমস্ত ধারাকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করে কত দ্রুত সুবিশাল শক্তি নিয়ে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের নব উত্থান ঘটবে। আবার শুরু হবে বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলনের জোয়ার। পরিদৃশ্যমান কঠিন, জটিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে এই দৃষ্টিভঙ্গীতেই বিচার করতে হবে। এটাই সময়ের আহ্বান।

অতএব, বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে বিশ্বের সকল দেশে যে শোষিত নির্যাতিত মানুষ তীব্র জ্বালা-যন্ত্রণায় লড়াইয়ের ময়দানে নামছে, মুক্তির পথ খুঁজছে, তাদের একমাত্র মার্কসবাদই সেই মুক্তিপথের সন্ধান দিতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিপ্লবের বাস্তব পরিস্থিতি বা অবজেকটিভ কন্‌ডিশন প্রস্তুত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চিন্তাগত পরিস্থিতি (সাবজেকটিভ কন্‌ডিশন) অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী দল যথাযথ আদর্শগত ও সাংগঠনিক শক্তি নিয়ে অনুপস্থিত। এই অভাব কে পূরণ করবে? এই অভাব পূরণের জন্য শ্রেণীসচেতন সর্বহারা বিপ্লবীদেরই এগিয়ে আসতে হবে। সকলকেই মনে রাখতে হবে, এই যুগে লেনিন মার্কসবাদকে যেভাবে সমৃদ্ধ, বিকশিত ও উন্নীত করেছেন, সেটাই এযুগের মার্কসবাদের উন্নত উপলব্ধি। আবার এই যুগেই লেনিন পরবর্তী অধ্যায়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে লেনিনবাদকে আরো সমৃদ্ধ ও উন্নত করেছেন ধারাবাহিকভাবে স্ট্যালিন, মাও সে তুং ও কমরেড শিবদাস ঘোষ। ফলে আজ যথার্থভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বুঝতে হলে এই তিনজনের ধারাবাহিক অবদানকে অথরিটি গণ্য করেই বুঝতে হবে। এটা না করতে পারলে মার্কসবাদের নামে পুনরায় সংশোধনবাদী বিচ্যুতি অনিবার্যভাবে দেখা দেবে। ফলে উপরোক্ত আদর্শকে হাতিয়ার করে দেশে দেশে শক্তিশালী মার্কসবাদী পার্টি গড়ে তুলতে হবে। এই পার্টিগুলির কর্তব্য হবে একদিকে সকল সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে, পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে জঙ্গি আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে দেশে দেশে ও আন্তর্জাতিক স্তরে ব্যাপকতম ফ্রন্ট বা ফোরাম গড়ে তোলা; একই সাথে অন্যদিকে নিজেদের শ্রেণীসংগ্রামলব্ধ অভিজ্ঞতা দ্বারা মত বিনিময়ের মাধ্যমে একে অপরকে সাহায্য করা, সবকিছুর উর্ধ্বে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের স্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়া, দেশে দেশে শ্রমিকশ্রেণী ও শোষিত জনগণের বিক্ষোভগুলিকে সুনির্দিষ্ট বৈপ্লবিক লক্ষ্যে পরিচালনা করা।

হরিপুরে বিপজ্জনক পরমাণু কেন্দ্র

ছয়ের পাতার পর

যেমন প্রভাব বিস্তার করা যাবে, তেমনি অস্ত্রের কারবার করেও মুনাফা আসবে। এই লক্ষ্য থেকেই কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার আগেই আমেরিকার সাথে পারমাণবিক চুক্তি করেছে। এখন রাশিয়ার সাথে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের চুক্তি করল। একইভাবে বিজেপি যখন কেন্দ্রীয় সরকারে ছিল, তারাও মিলিটারি তাকত বাড়িয়েছে। শিল্পপতিদের নতুন বিশ্বস্ত বন্ধু সিপিএমও এই কাজে কংগ্রেসের দোসর হিসাবে ভূমিকা নিচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করার প্রশ্নে পরমাণু চুক্তির বিরোধিতার কথা বলা যে কত বড় মিথ্যাচার, রাজ্যে পরমাণু কেন্দ্র স্থাপনে তাদের উদ্যোগেই তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। স্বাভাবিকভাবেই শাসকদলগুলির এই অপকর্ম শোষণে জর্জরিত দেশের গরিব-মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের সমর্থন পেতে পারে না।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের স্থান হিসাবে হরিপুরকে বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে শাসকশ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ চরিতার্থ করার একটি পরিকল্পনা আছে। সকলেই জানেন, ওড়িশার চাঁদিপুরে মিসাইল টেস্টিং রেঞ্জ আছে। নয়াচরে কেমিক্যাল হাব গড়ার পরিকল্পনা (যা নন্দীগ্রামে করার কথা ছিল) কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উভয়েরই। এখানে কুখ্যাত মার্কিন ডাউ কোম্পানির আসার কথা, যারা জীবাণু অস্ত্র তৈরিতে ওস্তাদ। এখানে জীবাণু অস্ত্র তৈরি হলে তা ক্ষেপণের জন্য মিসাইল রেঞ্জে যাবে। মিসাইল উৎক্ষেপণের জন্য পারমাণবিক জ্বালানি লাগবে। সেই জ্বালানি জোগান দিতে হরিপুরে প্লুটোনিয়াম তৈরি করতে তাদের পরমাণু চুল্লি চাই। তিনটি স্থানই কাছাকাছি করতে 'জনস্বার্থে'র ধুয়ো তুলে হরিপুরে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং নয়াচরে কেমিক্যাল হাব-এর মতো পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যার সাথে দেশের গরিব ও মধ্যবিত্তের স্বার্থের কোনও সম্পর্ক নেই।

কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের কাছে হরিপুরে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও নয়াচরে কেমিক্যাল হাব স্থাপনের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করার দাবি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত। রাজ্যের দলমত নির্বিশেষে গরিব-মধ্যবিত্ত মানুষকে এই ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক তেজস্ক্রিয় দূষণসৃষ্টিকারী পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলে সংগঠিত লাগাতার গণআন্দোলনের মাধ্যমে সরকারি পরিকল্পনা প্রতিরোধ করতে হবে। এ ছাড়া জনগণের সামনে আর কোনও পথ খোলা নেই।

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

বাসদ-এর কেন্দ্রীয় কনভেনশন

বাংলাদেশে বাম বিকল্প গড়ে তোলার ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম এগিয়ে নেওয়ার সংকল্প

৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় কেন্দ্রীয় সমাবেশে বাসদ নেতৃবৃন্দ এবং এস ইউ সি আই (সি) সহ আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট পার্টিগুলির নেতৃবৃন্দ। ডানদিকে, সমাবেশ অভিমুখে বিশাল মিছিলের একাংশ।

"বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন শাসকদের এক বছরের শাসনের মধ্য দিয়ে গত ৩৮ বছরের বুর্জোয়া শাসনের ব্যর্থতার নব অধ্যায় রচিত হয়েছে। বিদ্যমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া যে মানুষের দুর্ভাগ্যের দিন বদল হবে না, তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর জন্য প্রয়োজন দ্বি-দলীয় বুর্জোয়া বৃত্ত ভেঙে বাম বিকল্প গড়ে তোলা, একটি সঠিক বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রের আন্দোলনকে বেগবান ও শক্তিশালী করা, বুর্জোয়ার বিপরীতে বুর্জোয়া— এই দৃশ্যপট বদল করে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিপরীতে বাম বিকল্প শক্তিকে দণ্ডায়মান করা।" ৩০ ডিসেম্বর বিকালে ঢাকার মহানগর নাট্যমঞ্চ প্রাঙ্গণে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)-এর প্রথম কেন্দ্রীয় কনভেনশন উপলক্ষে আয়োজিত এক সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে এ কথা বলেন বাসদ আহ্বায়ক কমরেড খালেকুজ্জামান। সমাবেশে এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, কমরেড আবদুল্লাহ সরকার, কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, ভারতের এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড প্রভাস ঘোষ, শ্রীলঙ্কার নিউ ডেমোক্রেটিক পার্টি (মার্কসবাদী)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড ই থাম্বাইয়া, ইউনিফায়েড কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল (মাওবাদী)-র পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড ইন্দ্রমোহন সিজেল, ডেমোক্রেটিক পিপলস রিপাবলিক অফ কোরিয়ার বাংলাদেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত কমরেড সি হং চোল, ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড পার্টি (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সারা ফ্লাউন্ডার্স, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকশন সেন্টারের নেতা কমরেড মাইকেল ক্রেমার, ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট পিপলস সলিডারিটি কো-অর্ডিনেটিং কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মানিক মুখার্জী।

খালেকুজ্জামান বলেন, বিগত সরকারগুলির মতো বর্তমান সরকারও সন্ত্রাস-দুর্নীতি-দলীয়করণ-দখলদারিত্বকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য দায়ী সিন্ডিকেট এখনও সক্রিয়। শ্রমিকদের উপর মালিকদের নির্যাতন, বঞ্চনা বেড়ে চলেছে। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে গ্যাস-কয়লা সহ জ্বালানি সম্পদ সাম্রাজ্যবাদী কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। মার্কিন-ভারত যুদ্ধচক্রান্তে জড়িয়ে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে হুমকির মুখে ফেলা হচ্ছে। একমাত্র ঐক্যবদ্ধ বামশক্তিই এই অবস্থা কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতে পারে।

কনভেনশনের প্রস্তুতিপর্বে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল মিটিংয়ে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসাবে নির্বাচিত কমরেডস বজলুর রশীদ ফিরোজ, জাহেদুল হক মিলু, রাজেকুজ্জামান রতন ও সাইফুর রহমান তপনকে সমাবেশের শুরুতে জনতার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

সকালে একই স্থানে কনভেনশনের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনের পর একটি সুসজ্জিত মিছিল নগরীর বিভিন্ন রাজপথ প্রদক্ষিণ করে। সমাবেশ ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উল্লিখিত নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি বিচারপতি গোলাম রব্বানী, সাংবাদিক ফয়েজ আহমেদ, অধ্যাপক আকমল হোসেন, আবু সঈদ খান, বিমল বিশ্বাস, কৃষিবিদ মোহাম্মদ হোসেন মণ্ডল, কৃষিবিদ অধ্যাপক আবিদুর রেজা সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ও বাম নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পরদিন ৩১ ডিসেম্বর মহানগর নাট্যমঞ্চে অনুষ্ঠিত প্রতিনিধি সভায় ৪৯টি জেলার ৭০০ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে পার্টি আহ্বায়কের সাংগঠনিক-রাজনৈতিক রিপোর্ট, জাতীয়-আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর আলোচনা, পার্টি গঠনতন্ত্র চূড়ান্তকরণ এবং নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি অনুমোদন সহ অন্যান্য রাজনৈতিক-সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১ জানুয়ারি বিকেল ৪টায় পল্টনের মুক্তিভবনের মিলনায়তনে অন্যান্য দেশের ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির নেতৃবৃন্দের সাথে বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীদের মতবিনিময় সভাও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দেখুন, বিদ্যুতের দাম কী ভয়াবহ হারে বাড়ানো হয়েছে

সি ই এস সি		গত বছর ছিল (২০০৯)	এখন হল (২০১০)	টাকায়
গ্রাহকের শ্রেণী	ইউনিট	মাসিক চার্জ	মাসিক চার্জ	বৃদ্ধি
১। লাইফ লাইন	২৫	৫০.০০	৬২.০০	১২.০০
২। গৃহস্থ	২৫	৫৬.৭৫	৬৮.৭৫	১২.০০
	৬০	১৫৬.৫০	১৮৫.৩০	২৭.৮০
	১০০	৩০৮.১০	৩৫৬.১০	৪৮.০০
	১৫০	৫৩৯.৬০	৬১১.৬০	৭২.০০
	৩০০	১২৬১.১০	১৪০৫.১০	১৪৪.০০
৩। বাণিজ্যিক	৬০	২২০.৮০	২৪৯.৬০	২৮.৮০
	১০০	৩৭৭.২০	৪২৫.২০	৪৮.০০
	১৫০	৫৯৫.৭০	৬৬৭.৭০	৭২.০০
	৩০০	১৩৩৫.২০	১৪৭৯.২০	১৩৪.০০
		প্রতি ঘোড়া		
৪। শিল্প	৫০০	১৯৫০.০০	২১৯০.০০	২৪০.০০
	২০০০	৮৩৪০.০০	৯৩০০.০০	৯৬০.০০
	৩৫০০	১৫২১০.০০	১৬৮৯০.০০	১৬৮০.০০

ডাব্লু বি এস ই ডি সি এল		গত বছর ছিল (২০০৯)	এখন হল (২০১০)	টাকায়
গ্রাহকের শ্রেণী	ইউনিট	মাসিক চার্জ	মাসিক চার্জ	বৃদ্ধি
১। লাইফ লাইন	৭৫	১৪২.৫০	২০১.০০	৫৮.৫০
২। গৃহস্থ (গ্রামীণ)	৭৫	১৭০.২৫	২২৮.৭৫	৫৮.৫০
	১৮০	৪৩৩.৮০	৫৭৪.২০	১৪০.৪০
	৩০০	৭৯৯.৮০	১০৩৩.৮০	৩৩৪.০০
	৬৫০	১৮৬৪.৮০	২৩৩২.৮০	৪৯৮.০০
	৯০০	২৯৫৯.৮০	৩৬৬১.৮০	৭০২.০০
৩। গৃহস্থ (শহর)	৭৫	১৭৪.০০	২৩২.৫০	৫৮.৫০
	১৫০	৩৬৯.৭৫	৪৮৬.৭৫	১১৭.০০
	৩০০	৮৩৪.৭৫	১০৬৮.৭৫	২৩৪.০০
	৪৫০	১৩৭৭.৭৫	১৭২৮.৭৫	৩৫১.০০
	৯০০	৩০৯৬.৭৫	৩৭৯৮.৭৫	৭০২.০০
৪। বাণিজ্যিক	১৮০	৫৫৪.৪০	৬৯৪.৮০	১৪০.৪০
	৩০০	১০৬৫.৬০	১২৯৯.৬০	২৩৪.০০
	৪৫০	১৭৪৬.৬০	২০৯৭.৬০	৩৫১.০০
	৯০০	৩৯৫১.৬০	৪৬৫৩.৬০	৭০২.০০
৫। শিল্প	৫০০	১৫৯০.০০	১৯৮০.০০	৩৯০.০০
	২০০০	৮০৫৫.০০	৯৬১৫.০০	১৫৬০.০০

গণদাবীর ১৯ সংখ্যায় প্রকাশিত তালিকায় কিছু অসঙ্গতি থাকায় এবার অ্যাবেকার 'বিদ্যুৎ গ্রাহক সমাচার' থেকে পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরা হল।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় ছাত্রছাত্রীদের ডেপুটেশন ও ক্লাস

শিক্ষায় বেসরকারিকরণের নীল-নক্সা স্বরূপ ন্যাশানাল নলেজ কমিশন, যশপাল ও লিংডো কমিটির সুপারিশ বাতিল, সর্বশিক্ষা মিশনের টাকার যথাযথ ব্যবহার এবং সরকার নির্ধারিত ফি-তে ভর্তি নেওয়ার দাবি নিয়ে এ আই ডি এস ও-র দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির উদ্যোগে ৩০ ডিসেম্বর ডায়মন্ড হারবারে এস ডি ও এবং এ ডি আই এস (এস ই) দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ঐ দিন বিকাল থেকে ডায়মন্ড হারবার হাইস্কুলে জেলা রাজনৈতিক ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। ২৪২ জন স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী ক্লাসে উপস্থিত ছিল। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড কমল সাঁই শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি আক্রমণের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে তীব্র করার আহ্বান জানান। ৩১ ডিসেম্বর স্কুলের সামনে বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান, শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধার্ঘ ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে ক্লাসের কাজ শুরু হয়। ক্লাস পরিচালনা করেন এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী ও ডি এস ও-র সর্বভারতীয় কমিটির সহসভাপতি কমরেড সুব্রত গৌড়ী উপস্থিত ছিলেন।

দাবি আদায় ফুল ব্যবসায়ীদের

২০০৮-এর এপ্রিল মাসে মল্লিকঘাট ফুলবাজার সন্দেহজনকভাবে আগুনে পুড়ে যাবার পর প্রয়োজনীয় মেরামতি, ওয়্যারিং, অগ্নিনির্বাপণ ইত্যাদি ব্যবস্থা করার পরেও সি ই এস সি বিদ্যুৎ সংযোগ না দেওয়ায় ফুল ব্যবসায়ীরা 'মল্লিকঘাট ফুলবাজার বাঁচাও কমিটি' ও 'অ্যাবেকা'র নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে তোলেন। বিস্ময়করভাবে রাজ্য সরকার ফুলবাজারে বিদ্যুৎ সংযোগ না দিতে সিইএসসি-কে লিখিত নির্দেশ দেয়। আন্দোলন চলতে থাকে। দীর্ঘ আন্দোলনের পর বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের ওমবাডসম্যান গত মার্চ মাসে সিইএসসি-কে বিদ্যুৎ সংযোগ দেবার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও সি ই এস সি টালবাহানা করতে থাকে। আন্দোলন তীব্রতর হওয়ার পর ২৯ ডিসেম্বর বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে ১ জানুয়ারি ফুল ব্যবসায়ীদের বিজয় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন টি এম সি নেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায়, এস ইউ সি আই (সি) নেতা কমরেড সদানন্দ বাগল। সভায় অ্যাবেকার সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাস লক্ষ্যে অবিচল থেকে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য ফুল ব্যবসায়ীদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানান এবং বলেন, এই জয় প্রত্যেকের বিদ্যুৎ সংযোগ পাবার অধিকারকেই প্রতিষ্ঠা করল। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিটির সভাপতি ভানুচরণ সাউ ও বক্তব্য রাখেন ফুলচাষি ও ফুল ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়েক, অশোক গিরি, কৃষ্ণচন্দর বেরা ও স্বপন বর্মণ প্রমুখ।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci.in